সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুমহান মর্যাদা কুরআনের আয়াতের আলোকে	২
দরূদ শরীফের গুরুত্ব ও তাৎপয	৩
হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে মহানবী (সা.)-এর উচ্চ ও সুমহান মর্যাদা	৪
হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ, ২৮ শে ডিসেম্বর, ২০১৬	৫
মহানবী (সা.)-এর জীবনী ন্যায়পরায়ণতা এবং ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে	১০
নবুয়তের প্রাথমিক যুগের কতিপয় ঘটনা	১৪
মহম্মদ (সা.)-এর অমর বাণী এবং উর্দু নযম	১৫
মহানবী (সা.)-এর জীবনি একজন আদর্শ দায়ী-ইলাল্লাহ্	১৬
সেই পরমোপকারী ব্যক্তির উপর দিনে শত শত বার দরূদ প্রেরণ কর	২০
শান্তির রাজদূতঃ হযরত মুহাম্মদ (সা.)	২২

সম্পাদকীয়

খাতামান্নাবীঈনের প্রকৃত ব্যাখ্যা

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লেখনীর আলোকে:

সুরা আহযাবের ৪১ নম্বর আয়াতে আঁ হযরত (সা.)-কে আল্লহ্ তা'লা খাতামান্নাবীঈন সম্বোধন করে মহা সম্মানে ভূষিত করেছেন। খাতামান্নাবীঈন-এর অর্থ হল- ১) সমস্ত নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (২) সেই নবী যার মধ্যে নবুয়তের যাবতীয় পরাকাষ্ঠা পূর্ণতা পেয়েছে। যেদিকে এই আয়াত ইঙ্গিত করে-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (৩)

নবীদের মোহর, কেননা 'খাতাম' শব্দের আরও একটি অর্থ মোহর। এর অর্থ হল আধ্যাতিক জগতের কোন মর্যাদা ও সম্মান তাঁর মোহরের সত্যায়ন ব্যতিরেকে কেউ অর্জন করতে পারবে না। এর সত্যায়ন এই আয়াতটি করে- قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ - অর্থাৎ তুমি বলে দাও, যদি তোমরা চাও যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসুক তবে তোমরা আমার আনুগত্য কর, এর পরিণামে আল্লাহ্ তা'লাও তোমাদেরকে ভালবাসবেন। অতএব, যখন আল্লাহ্র ভালবাসা তাঁর আনুগত্যের উপর নির্ভর করছে, তবে আধ্যাত্মিক জগতের কোন মর্যাদা বা সম্মান লাভ করা তাঁর আনুগত্য এবং সত্যায়নের মোহর ছাড়া কিভাবে সম্ভব? (৪) খাতামান্নাবীঈন-এর একটি অর্থ হল নবীদের আধ্যাত্মিক পিতা। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে তাঁর দৈহিক পিতা হওয়ার বিষয়কে অস্বীকৃতি দিয়েছেন, কেননা, দৈহিক পিতা হওয়া তুচ্ছ মর্যদা। কিন্তু আধ্যাত্মিক পিতা হওয়া একটি অনেক বড় সম্মান। অতএব আল্লাহ তা'লা সুরা আহযাবের ৪১ নম্বর আয়াতে যেখানে তাঁর দৈহিক পিতা হওয়াকে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন সেখানে তাঁকে সমস্ত নবীগণের আধ্যাত্মিক পিতা আখ্যায়িত করছেন যা একটি মহান সম্মান ও মর্যাদা। (৫) খাতামান্নাবীঈন-এর অর্থ হল শেষ শরীয়তধারী নবী। তাঁর পর এখন কোন শরীয়তধারী নবী আসতে পারে না, আর না কোন শরীয়তযুক্ত কিতাব আসতে পারে। কুরআন করীম শেষ শরীয়ত, এটি কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। রসূল করীম (সা.) শেষ শরীয়তধারী নবী। কিন্তু তাঁর আনুগত্যে ও দাসত্বে নবী আসতে পারে যা এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়। -

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ○

অর্থাৎ যে কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর আনুগত্য করবে সে নবী, সিদ্দিক, শহীদ এবং সালেহ-এগুলির মধ্যে যে কোন একটি পুরস্কার পেতে পারে। যদি একথা বল যে, নবী হতে পারে না, যেরূপ আমাদের অ-আহমদী ভাইয়েরা বলে থাকে, তবে এর অর্থ হবে সিদ্দিক, শহীদ এবং সালেহও হতে পারবে না। (৬) খাতামান্নাবীঈন-এর অর্থগুলির মধ্যে একটি এও অর্থ অন্তর্নিহিত আছে যে, আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি পরম আনুগত্যের পরিণামে আল্লাহ্ তা'লা ইলহাম ও ঐশী বার্তালাপের সম্মানেও ভুষিত করেন। কেননা, যে নবীর আনুগত্যে নবুয়ত পাওয়া যেতে পারে তাঁর আনুগত্যের পরিণামে খোদা তা'লার সঙ্গে বার্তালাপ করার সৌভাগ্য কেন হবে না?

খাতামান্নাবীঈনের যে সকল অর্থ উপরে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলি সবই আঁ হযরত (সা.)-এর মর্যদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের অ-আহমদী বন্ধুরা আঁ হযরত (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন এই অর্থে অবশ্যই মান্য করে যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী কিন্তু খাতামান্নাবীঈন-এর এমন ব্যাখ্যা করে যে তাঁর থেকে সমস্ত গুণাবলী ছিনিয়ে নেয়। যেমন-তাঁর পর আর কোন নবী আসতে পারে না। অর্থাৎ তাঁর আনুগত্যের ফলে ছায়া নবী বা উম্মতী নবী আসতে পারে না। একটি মহান পুরস্কার যার দরজা আল্লাহ্ তা'লা বন্ধ করেছেন আর না তাঁর রসূল বন্ধ করেছেন, এই দরজা এরা নিজেরাই বন্ধ করছে। আরও একটি গুণ বা বৈশিষ্ট যা তারা বিলোপ করতে চায় সেটি হল এই যে, মহানবী (সা.)-এর পর ওহী ও ইলহামের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ সেই কল্যাণ ধারা যা পূর্বের উম্মতদের মধ্যে তাদের নবী গত হওয়ার পর অব্যাহত থেকেছে, সেই কল্যাণধারা তিনি (সা.) অব্যাহত রাখেন নি বরং ব্যহত করেছেন। অর্থাৎ নবুয়তও বন্ধ, ইলহাম ও ওহীও বন্ধ, মোটকথা তিনি (সা.) যেন আধ্যাত্মিকতার সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছেন।

আঁ হযরত (সা.)-এর ছায়ায় প্রতিপালন একজন তুচ্ছ মানুষকে মসীহ রূপে গড়ে তুলতে পারে

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: ওহে মূর্খরা, ওহে চক্ষুষ্মান অন্ধরা, আমাদের নেতা ও প্রভু, তাঁর প্রতি হাজার সালাম, নিজ জ্যোতিঃ বিকিরণ ক্ষমতায় সব পয়গম্বরদের অগ্রণী হয়েছেন। পূর্বতন পয়গম্বরের জ্যোতি বিকিরণ ক্ষমতা এক নির্দিষ্ট সীমায় উপনীত হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে। এখন সেসব ধর্ম ও সেসব জাতি মৃত ও জীবনবিহীন। এদের জীবন লয় পেয়েছে। কিন্তু আঁ হযরত (সা.)-এর রূহানী ফয়েজ বা আধ্যাত্মিক জ্যোতি বিকিরণ শক্তি বিদ্যমান থাকতে, পরজাতি হতে মসীহ আগমণ করার আবশ্যকতা নেই। না! না! বরং তাঁর ছায়ায় প্রতিপালন অতি সামান্য মানুষকেও মসীহরূপে গড়ে তুলতে পারে, যেমন তিনি আমাকে মসীহ রূপে গড়ে তুলেছেন। (চশমায়ে মসীহি, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৯)

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

আয়াতের মধ্যে নিহিত ভবিষ্যদ্বাণী

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা তা অবগত নয়। আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতে জানিয়েছেন , আঁ হযরত (সা.)-এর পর কেয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পথ রুদ্ধ করা হয়েছে এবং এটি সম্ভব নয় যে, এরপর কোন হিন্দু, ইহুদী, খৃষ্টান বা কোন নামধারী মুসলমান নিজেকে নবী বলে সাব্যস্ত করে। নুবওতের সকল পথ অবরুদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু একটি পথ সিরাতে সিদ্দীকির (সিদ্দীকিয়তের রাস্তা) খোলা আছে, যাকে 'ফানাফির রসূল' বলে। সুতরাং এ পথ দিয়ে যে ব্যক্তি খোদার নিকটবর্তী হয়, তাকে প্রতিচ্ছায়ারূপে মুহাম্মদী নবুওয়েতর বসনেই ভূষিত করা হয়।

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ১৮তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৭)

সৈয়্যদানা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কে আল্লাহ তা'লা আঁ হযরত (সা.)-এর আনুগত্য এবং পরম ভালবাসার পরিণামে এই যুগের ইমাম এবং মসীহ ও মাহদী করে পাঠিয়েছেন। উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এটি অনেক বড় পুরস্কার। এটিকে উপেক্ষা করা চরম পর্যায়ের পশ্চাদবর্তীতা এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অকৃতজ্ঞতা এবং এই পৃথিবীতে লাঞ্ছনার কারণ। আমাদের দোয়া আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান ভাইদেরকে তৌফিক দিন তারা যেন গম্ভীরতাপূর্বক হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী অধ্যায়ন করে তাঁর সত্যতা সম্পর্কে অবগত হয় এবং তাঁর উপর ঈমান আনে। (আমীন)

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুমহান মর্যাদা কুরআনের আয়াতের আলোকে

কুরআন করীমে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র নামের উল্লেখ

۞ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا (الاحزاب:41)

মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কাহারও পিতা নহে, কিন্তু সে আল্লাহ্‌র রসূল এবং নবীগণের মোহর। এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

۞ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ (محمد:3)

এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে এবং যাহা মুহাম্মদের উপর নাযেল করা হইয়াছে উহার উপরও ঈমান আনে-বস্তুতঃ ইহা তাহাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে পূর্ণ-সত্য-তিনি তাহাদের অনিষ্টতা সমূহকে দূরীভুত করিয়া দিবেন এবং তাহাদের অবস্থার সংশোধন করিয়া দিবেন।

۞ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَا۟ئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ (آل عمران:145)

এবং মুহাম্মদ কেবল একজন রসূল। তাহার পূর্বেকার সকল রসূল অবশ্যই মারা গিয়াছে। অতএব, সে যদি মৃত্যু বরণ করে অথবা নিহত হয়, তাহা হইলে তোমরা কি তোমাদের গোড়ালির উপর (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) ফিরিয়া যাইবে? এবং যে ব্যক্তি তাহার গোড়ালিদ্বয়ের উপর ফিরিয়া যাইবে সে আদৌ আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এবং অচিরেই আল্লাহ্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণকে প্রতিদান দিবেন।

বাংলা অনুবাদ কুরআন থেকে তফসীর: এই আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্য সম্পর্কে নিশ্চিত ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মহম্মদও (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল এবং তিনি রসূল ছাড়াই আর কিছুই নন। তাঁর পূর্বে যত রসূল ছিলেন, সকলেই মৃত্যু বরণ করেছেন। 'খালা' শব্দ যখন কারো সম্পর্কে যখন বহুবচনে ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ এমনটি করা হয় যেমন একজন মুসাফির বা পথিক পথ অতিক্রম করে, বরং এখানে অতিক্রান্ত হওয়া বলতে প্রয়াত হওয়াকে বোঝানো হয়ে থাকে। অতএব ঈসা (আ.) যদি আল্লাহ্‌র রসূল হয়ে থাকেন তবে তিনি অবশ্যই মৃত্যু বরণ করেছেন।

۞ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا (الفتح:30)

মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল, এবং যাহারা তাহার সঙ্গে আছে, তাহারা কাফেরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর কিন্তু পরস্পরের প্রতি দয়াদ্রচিত্ত। তুমি তাহাদিগকে রুকূ ও সেজদারত দেখিতে পাইবে, তাহারা সর্বদা আল্লাহ্‌র ফযল ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য যত্নবান থাকে। সেজদার চিহ্নের দরুন তাহাদের চেহারায় তাহাদের (পরিচয়ের) লক্ষণাবলী রহিয়াছে। তাহাদের এই বিবরণ তওরাতে আছে, এবং ইঞ্জিলেও আছে তাহাদের বিবরণ, এক শস্য ক্ষেতের ন্যায়, যাহা নিজ অঙ্কুর নির্গত করে, অতঃপর উহাকে সুদৃঢ় করে ফলে উহা আরও পুষ্ট হয়, অতঃপর উহা স্বীয় কাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যাহা কৃষককে আনন্দিত করে, যেন তিনি তাহাদের (মোমেনদের উন্নতি) দ্বারা কাফেরদিগকে ক্রোধান্বিত করেন। তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে ক্ষমা এবং মহা প্রতিদানের অঙ্গিকার করিয়াছেন।

বাংলা অনুবাদ কুরআন থেকে তফসীর : এই আয়াতে হযরত মহম্মদ (সা.)-এর যে সব গুণাবলী সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলিকে কেবল তাঁর সত্তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখা হয় নি বরং এর পরেই বলা হয়েছে, وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ অর্থাৎ তাঁর গুণাবলী তাদের মধ্যেও প্রবেশ করেছে যারা সঙ্গে ছিল। গুণাবলীর মধ্যে প্রথমটি اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ -এর অর্থ এই নয় তারা কুফফারদের প্রতি অতি কঠোর মনোভাব পোষণ করে, বরং এর অর্থ হল কুফরের প্রভাব গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদেরকে অনমনীয় বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ কৃপা ও দয়ায় পরিপূর্ণ যার কারণে মোমেনরা পরস্পরের প্রতি দয়াসূলভ আচরণ করে। এবং তাদের জিহাদের উদ্দেশ্য কেবল খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভ, জাগতিক আয়-উপার্জন নয়। তারা আল্লাহ্‌র দরবারে রুকূ এবং সিজদারত হয়ে তাঁর কৃপা ভিক্ষা করে অর্থাৎ এমন সম্পদ চাইবে যার সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি জড়িত থাকে।

এবং আঁ হযরত (সা.)-এর উম্মমে শেষ যুগে আগমণকারী মসীহ এবং তাঁর মান্যকারীদের যতদূর সম্পর্ক, ইঞ্জিলে তাদের উপমা এমন অঙ্কুরের ন্যায় দেওয়া হয়েছে যা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয় এবং নিজের কান্ডের উপর দৃঢ় হয়ে দাঁড়ায় এবং তা দেখে বীজ বপনকারী অর্থাৎ ধর্মের সেবায় অংশগ্রহণকারীরা আনন্দিত হয় এবং এরফলে কুফফাররা তাদের উপর আরও বেশি ক্রোধান্বিত হয়। এবং আল্লাহ্ তাদেরকেও মহা প্রতিদান ও ক্ষমার সুসংবাদ দিয়েছেন যারা তাঁর উপর সত্যিকার ঈমান এনেছে এবং তাঁর কাছে মাগফেরাত চায়।

۞ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ (الانبياء:108)

এবং আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত স্বরূপই প্রেরণ করিয়াছি।

۞ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۢ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا

অতএব, তখন (তাহাদের) কেমন অবস্থা হইবে যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং তোমাকেও এইসব লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব? (আন-নিসা: ৪২)

۞ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا

হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে তোমাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসিয়াছে, এবং আমরা তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল আলোক নাযেল করিয়াছি। (আন-নিসা: ১৭৫)

۞ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا (الاحزاب:46,47)

হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি সাক্ষী এবং সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে, এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাঁহার দিকে আহ্বানকারী এবং দীপ্তিমান প্রদীপরূপে।

۞ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۙ رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ

আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমাদের প্রতি নাযেল করিয়াছেন এক স্মারক- এক রসূল, যে তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, যেন সে -যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে- তাহাদিগকে অন্ধকাররাশি হইতে বহিষ্কার করিয়া নূরের দিকে লইয়া আসে।

দরূদ শরীফের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

কেউ যখন আমার উপর শান্তি বর্ষণ করে, তার উত্তর দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'লা আমার আত্মাকে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

۞ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ یُسَلِّمُ عَلَیَّ اِلَّا رَدَّ اللّٰهُ عَلَیَّ رُوْحِیْ اَرُدَّ عَلَیْهِ السَّلَامَ۔

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যে কেউ আমার জন্য শান্তি কামনা করে, তার উত্তর দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমার আত্মাকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। (অর্থাৎ আঁ হযরত (সা.)-এর উপর সালাম প্রেরণকারী সেই দরূদের এমন প্রতিদান প্রাপ্ত হয় যেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ তার উত্তর দিচ্ছেন।

(আবু দাউদ, কিতাবুল মানাসিক, বাব যিয়ারাতুল কুবুর)

দরূদ প্রেরণ করার নিয়ম

۞ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ عَلَیْنَا النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْنَا كَیْفَ نُسَلِّمُ عَلَیْكَ فَكَیْفَ نُصَلِّیْ عَلَیْكَ ؟ قَالَ: قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

হযরত কা'ব বিন উজরা (রা.) বর্ণনা করেন: আঁ হযরত (সা.) যখন আমাদের এখানে আগমণ করেন আমি তাঁকে নিবেদন করি, হে রসূলুল্লাহ! আমরা জানি যে আপনার প্রতি সালাম কিভাবে প্রেরণ করব, কিন্তু এটা জানি না যে, দরূদ কিভাবে প্রেরণ করব। তিনি (সা.) বললেন: আমার উপর এইভাবে দরূদ পাঠাবে- হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরগণের ওপরে আশিস বর্ষণ করো যেভাবে তুমি ইব্রাহীম ও বংশধরগণের ওপরে আশিস বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি মহাপ্রশংসিত মহামর্যাদাবান। হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরগণের ওপরে কল্যাণ বর্ষণ করো যেভাবে তুমি ইব্রাহীম ও বংশধরগণের ওপরে কল্যাণ বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি মহাপ্রশংসিত মহামর্যাদাবান। (মুসলিম, কিতাবুস সালাত)

তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামাযে দোয়া করে তখন সে যেন প্রথমে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসাকীর্তন করে এবং তার পর নবী করীম (সা.)-এর উপর দরূদ পাঠ করে।

۞ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَیْدٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا یَدْعُوْ فِیْ صَلٰوتِهٖ لَمْ یُمَجِّدِ اللّٰهَ تَعَالٰی، وَلَمْ یُصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : عَجِلَ هٰذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهٗ ۔ اَوْ لِغَیْرِهٖ ۔ اِذَا صَلّٰی اَحَدُكُمْ فَلْیَبْدَأْ بِتَحْمِیْدِ رَبِّهٖ سُبْحَانَهٗ وَالثَّنَآءِ عَلَیْهِ ثُمَّ یُصَلِّیْ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ یَدْعُوْ بَعْدُ بِمَا شَآءَ۔ (ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب الدعا)

হযরত ফাযালা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.) এক ব্যক্তিকে নামাযে দোয়া করতে শোনেন। সে আল্লাহ্র প্রশংসাকীর্তনও করেনি আর না সে আঁ হযরত (সা.)-এর উপর দরূদ পাঠ করেছিল। তিনি (সা.) বললেন: এই ব্যক্তি তাড়াহুড়ি করেছে, ধৈর্যের পরিচয় দেয় নি এবং সঠিক পদ্ধতিতে দোয়া করে নি। তিনি সেই ব্যক্তিকে ডেকে বললেন: যখন তোমাদের মধ্যে নামাযে দোয়া করে সে যেন প্রথমে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসাকীর্তন করে অতঃপর নবী করীম (সা.)-এর উপর দরূদ পাঠ করে এবং এরপর ইচ্ছা অনুযায়ী দোয়া করে।

আল্লাহ্ তা'লা চিরতরের জন্য আদেশ দিলেন যে, ভবিষ্যতে মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দরূদ প্রেরণ করবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

" আমাদের সৈয়্যদ ও মৌলা হযরত মহম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্যনিষ্ঠতার প্রতি লক্ষ্য করুন। তিনি (সা.) সকল প্রকারের কু-প্রথার মোকাবেলা করেছেন, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন, কিন্তু কোন পরোয়া করেন নি। এই সত্যনিষ্ঠার কারণেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর উপর কৃপা করেছেন এবং তিনি বলেছেন-

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ ؕ یٰٓاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا (الاحزاب ۵۷)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর ফেরেস্তাগণ রসুলের উপর দরুদ প্রেরণ করেন। হে যারা ঈমান এনেছে! তোমরা নবী (সা.)-এর উপর দরূদ প্রেরণ কর।

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, রসূল করীম (সা.)-এর কর্ম এমন ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর গুণাবলীর প্রকাশ বা প্রশংসার উপর জোর দেওয়ার জন্য কোন বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করেন নি। যদিও শব্দ পাওয়া যেত, কিন্তু তিনি ব্যবহার করেন নি। অর্থাৎ তাঁর পুণ্যকর্মসমূহের প্রশংসা গুরুত্বপ্রদানের উর্দ্ধে ছিল। এই ধরণের আয়াত অন্য কোন নবীর সম্মানে ব্যবহার করেন নি। তাঁর মধ্যে সেই সত্যনিষ্ঠতা ছিল এবং তাঁর কর্ম খোদার দৃষ্টিতে এমন পছন্দনীয় ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা চিরতরের জন্য আদেশ দিলেন যে, ভবিষ্যতে মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দরূদ প্রেরণ করবে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩)

খোদা তায়ালার জ্যোতির যশ পৌছানোর বিষয়ে আহলে বায়ত (রসুলুল্লাহ সাঃ এর বংশধর) এর অপরিসীম মহান গুরুত্ব রয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"এক রাত্রিতে এই অধম এত অধিকহারে দরুদ শরীফ পড়ল যে মন ও প্রাণ সুরভিত হয়ে উঠল। সেই রাত্রিতেই স্বপ্নে দেখলাম যে (ফিরিস্তিরা) শুদ্ধ ও শীতল পানীয় রূপে জ্যোতিতে পরিপূর্ণ মশক (চামড়ার থলে) এই অধমের গৃহে বয়ে নিয়ে আসছে। এবং তাদের মধ্যে একজন বলল এগুলি ঐসকল বরকত যা তুমি মহম্মদ (সাঃ) এর প্রতি প্রেরণ করেছিলে। এরকম আরও একটি বিচিত্র ঘটনা স্মরণে আসল ,একদা ইলহাম হল যার অর্থ এই ছিল যে ফিরিস্তাদের স্থানে (দেবালয়ে) বাগ বিতন্ডা চলছে। অর্থাৎ ধর্মের পুনর্জীবনের জন্য ঐশী ইচ্ছা উদ্বেলিত হচ্ছে।" (ধর্মকে নতুন রূপে জীবিত করার জন্য) "কিন্তু এখনও ফিরিস্তাদের নিকট (দেবালয়ে) নব জীবন দানকারীর নিযুক্তি উন্মোচিত হয়নি। (যে ব্যক্তি ধর্মকে জীবিত করবে তার পরিচয় অজ্ঞাত আছে) "এই জন্য তারা দ্বিধা বিভক্ত। এরই মধ্যে স্বপ্নে দেখি যে লোকেরা এক নব জীবন দানকারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারপর এক ব্যক্তি এই অধমের সম্মুখে উপস্থিত হল এবং ইঙ্গিত করে বলল 'হাযার রাজুলু ইউহেব্বুর রাসূল' অর্থাৎ ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি রসুলুল্লাহ(সাঃ) কে ভালবাসেন। এই কথার অর্থ এই ছিল যে , এই পদের জন্য সবচায়তে বড় শর্ত হল রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ভালবাসা। অতএব তা এই ব্যক্তির মধ্যে প্রমাণিত। (অর্থাৎ এর মধ্যে বিদ্যমান) "এবং উপরোক্ত এমন ইলহাম যাতে রসুলে করীম (সা.)-এর বংশধরদের প্রতি দরুদ প্রেরণ করার আদেশ রয়েছে , এখানেও সেই গোপন রহস্য রয়েছে যে খোদা তায়ালার জ্যোতির যশ পৌছানোর বিষয়ে আহলে বায়ত (রসুলুল্লাহ সাঃ এর বংশধর) এর অপরিসীম মহান গুরুত্ব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি খোদা তায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত সে ঐসকল পবিত্র ও শুদ্ধ আত্মাদেরই উত্তরাধিকারী হয় এবং জ্ঞানসমূহ ও তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী বলে গণ্য হয়।" (বারাহীনে আহমদীয়া, পৃষ্ঠা: ৫৭৬)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে মহানবী (সা.)-এর উচ্চ ও সুমহান মর্যাদা

আমি তাঁর আনুগত্য করে, তাঁকে ভালবেসে আমার নিজের উপরে আসমানী নিদর্শন প্রকাশিত হতে দেখেছি

আমি সেই খোদার কসম খেয়ে বলছি, যার নাম নিয়ে মিথ্যা বলা কঠিন অপরাধ, খোদা আমাকে আমার মান্যবর, যাঁর আনুগত্য অবশ্য কর্তব্য, সেই সৈয়্যদানা মুহাম্মদ (সা.)-এর আধ্যাত্মিক জীবনের এবং তাঁর গৌরব ও সাফল্যের এই প্রমাণ দিয়েছেন যে, আমি তাঁর আনুগত্য করে, তাঁকে ভালবেসে আমার নিজের উপরে আসমানী নিদর্শন প্রকাশিত হতে দেখেছি এবং হৃদয়কে দৃঢ় বিশ্বাসের আলোয় পরিপূর্ণ পেয়েছি। এবং আমি এত বেশী গায়েবী নিদর্শন দেখেছি যে, সেগুলির উদ্ভাসিত আলোকের মাধ্যমে আমি খোদাকে দেখতে পেয়েছি।'

(তিরইয়াকুল কুলুব, পৃষ্ঠা: ১১)

পবিত্র এবং পূর্ণ তওহীদ কেবল আঁ হযরত (সা.)-এর মাধ্যমেই লাভ হয়

" আমি সর্বদা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করি যে,এই যে আরবী নবী যাঁর নাম 'মুহাম্মদ' (তাঁর প্রতি হাজার হাজার দরুদ ও সালাম), তিনি কতই না উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর উচ্চ অবস্থান বা মোকামের সীমা কল্পনাও করা যায় না এবং তাঁর পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ও কার্যকারিতার সঠিক অনুমান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আফসোস যে, তাঁর মর্যাদা যেভাবে সনাক্ত করা উচিত ছিল, সেভাবে সনাক্ত করা হয় নি। সেই তওহীদ যা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তিনিই একমাত্র বীরপুরুষ, তা দুনিয়াতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষের প্রতি ভালবাসায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। এজন্যই খোদা, যিনি তাঁর (সা.) হৃদয়ের রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সমস্ত নবী ও সমস্ত প্রথম ও শেষের ব্যক্তিগণের অর্থাৎ আউয়ালীন ও আখেরীনদের উপরে উন্নীত করেছেন। এবং তাঁর কাঙ্খিত সকল প্রত্যাশাই তাঁর জীবনে পূর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক কৃপা ও কল্যাণের ঝরণার উৎস। যে ব্যক্তি তাঁর কৃপা ও কল্যাণসমূহ স্বীকার না করেই কোনও প্রকারে কোনও শ্রেষ্ঠত্বে দাবী করে সে মানুষ নয়, সে শয়তানের বংশধর। কেননা, প্রতিটি শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে। এবং প্রত্যেক মারেফাতের (জ্ঞান ও প্রজ্ঞার) ভাণ্ডার তাঁকেই দান করা হয়েছে। যে তাঁর মাধ্যমে না পায়, চির বঞ্চিত। আমি কী বস্তু, আমার আছেই বা কি! আমি নেয়ামত বা উত্তম পুরস্কারের অস্বীকারকারী হব, যদি না আমি একথা স্বীকার করি যে, প্রকৃত তওহীদ আমি ঐ নবীর মাধ্যমেই লাভ করেছি। জীবিত খোদার পরিচয় আমি পেয়েছি ঐ কামেল ও পূর্ণ নবীর মাধ্যমেই, তাঁরই আলোকের মধ্য দিয়ে। খোদার সাথে কথা বলার এবং সম্বোধিত হওয়ার, যার মাধ্যমে আমরা খোদার চেহারা দেখে থাকি-তার সৌভাগ্য লাভ করেছি ঐ মহান নবীরই মাধ্যমে। ঐ হেদায়াতের সূর্যের রশ্মিমালা আমার উপরে প্রখর রৌদ্রের ন্যায় পতিত হয় এবং তার মধ্যে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, ততক্ষণ আমি আলোকিত হতে থাকি।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৫-১১৮)

আঁ হযরত (সা.)-এর খাঁটি অন্তকরণে অনুবর্তিতা ও তাঁহার প্রতি ভালবাসা পরিণামে মানুষকে খোদার প্রিয় বানাইয়া দেয়

'আল্লাহ্ তা'লা কাহাকেও ভালবাসার জন্য এই শর্ত রাখিয়াছেন যে, এইরূপ ব্যক্তিকে আঁ হযরত (সা.)-এর অনুবর্তিতা করিত হইবে। বস্তুত: আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, আঁ হযরত (সা.)-এর খাঁটি অন্তকরণে অনুবর্তিতা ও তাঁহার প্রতি ভালবাসা পরিণামে মানুষকে খোদার প্রিয় বানাইয়া দেয়। ইহা এই ভাবে হয় যে, এইরূপ অবস্থায় তাহার নিজের হৃদয়ে খোদা প্রেমের একটি দহন সৃষ্টি হয়। তখন এইরূপ ব্যক্তি সব কিছু হইতে নির্লিপ্ত হইয়া খোদা-প্রেমের একটি বিশেষ বিকাশ হয় এবং খোদা তাহাকে পূর্ণ মাত্রায় প্রেম ও ভালবাসার রঙ দান করিয়া আবেগের শক্তিসহ নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। তখন সে প্রবৃত্তির আবেগের উপর জয় লাভ করে এবং তাহার সাহায্য ও সমর্থনে সবদিক হইতে খোদা তা'লার অলৌকিক ক্রিয়া নিদর্শনরূপে প্রকাশিত হয়।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৬)

এই মনোনীত নবী চিরকালের জন্য জীবিত

পৃথিবীতে মানবজাতির জন্য এখন কোরআন ভিন্ন কোন কিতাব নাই। সমস্ত আদম সন্তানের জন্য মহম্মদ (সা.) ব্যতীত কোন রসূল এবং শাফি নেই। অতএব তোমরা সেই মহাগৌরবসম্পন্ন ও প্রতাপাশালী নবীর সঙ্গে সত্যিকার প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাউকে তাঁর উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্টত্ব প্রদান করো না যাতে তোমরা উর্দ্ধলোকে নাজাত প্রাপ্ত হিসেবে গণ্য হও। স্মরণ রেখ! নাজাত সেই জিনিষের নাম নয় যা মৃত্যুর পর প্রকাশ পায়। বরং প্রকৃত নাজাত সেটিই যা এই পৃথিবীতেই স্বীয় জ্যোতিঃ প্রদর্শন করে থাকে। নাজাত প্রাপ্ত কে? সেই ব্যক্তি, যে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁহার ও তাঁহার সকল জীবের মধ্যবর্তী শাফী এবং আকাশের নীচে তাঁহার সম মর্যাদা বিশিষ্ট অপর কোন রসূল নেই। কুরআনের সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নেই। অন্য কাউকেও খোদা তা'লা চিরকাল জীবিত রাখার ইচ্ছা করেন নি কিন্তু এই মনোনীত নবী চিরকালের জন্য জীবিত।

(কিশতি নূহ, পৃষ্ঠা: ১৩)

আমাদের নবী (সা.) প্রতাপ ও সৌন্দর্য উভয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিপূর্ণ ছিলেন

আমাদের নবী (সা.) প্রতাপ ও সৌন্দর্য উভয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিপূর্ণ ছিলেন। মক্কার জীবন ছিল তাঁর সৌন্দর্যের প্রকাশক এবং মদিনার জীবন ছিল প্রতাপশালী ও গৌরবময়। তাঁর উভয় গুণই উম্মতের মধ্যে এমনভাবে বিতরিত হল যে, সাহাবাগণ (রা.) ছিলেন গৌরবপূর্ণ ও প্রতাপশালী জীবনের প্রতীক অপরদিকে মসীহ মওউদ হলেন আঁ হযরত (সা.)-এর সৌন্দর্যের প্রকাশস্থল।

(রূহানী খাযায়েন, ১৭ তম খণ্ড, আরবাঈন নম্বর- ৪, পৃষ্ঠা: ১৩)

উৎকৃষ্টতম পবিত্র ও প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা দানকারী

আমাকে বলা হয়েছে যে, সমস্ত ধর্মের মধ্যে ইসলামই হল সত্য ধর্ম এবং সমস্ত হিদায়তসমূহের মধ্যে কেবল কুরআনের হিদায়তই অক্ষত এবং মানবীয় হস্তক্ষেপ মুক্ত। আমাকে বোঝানো হয়েছে যে, সমস্ত রসূলের মধ্যে পরিপূর্ণ, উৎকৃষ্টতম, পবিত্র ও প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা দানকারী। এবং নিজের জীবনযাপন দ্বারা মানবীয় পরাকাষ্ঠার সর্বোৎকৃষ্ট নুমনা প্রদর্শনকারী হলেন হযরত সৈয়্যাদানা ও মৌলানা মহম্মদ মুস্তাফা (সা.)

(আরবাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭-৮)

আমরা যদি চাই যে, আল্লাহ তা'লার নৈকট্য অর্জিত হোক, আল্লাহ্ তা"লা আমাদের দোয়া গ্রহণ করুক, আমাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা সৃষ্টি হোক, তবে এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি নীতি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন এই সমস্ত বিষয় তোমরা তখনই অর্জন করতে পারবে যখন তোমরা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শ অনুযায়ী নিজেদের পরিচালিত করবে, এবং তাঁর আদর্শকে বোঝার জন্য, সেই আদর্শবলীর উপর অনুশীলন করার জন্য এটিও আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ যে, তিনি সাহাবা (রা.) গণের মাধ্যমে সেই সকল আদর্শ আমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন যেগুলির উপর মহানবী (সা.) আমল করতেন। কিন্তু একথাও অনুধাবন করা আবশ্যক যে মহানবী (সা.) কেবল সেই সমস্ত কাজ করতেন এবং কথা বলতেন যেগুলি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বর্ণনা করেছেন।

আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র জীবন থেকে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা, ইবাদত প্রতিষ্ঠা, সত্যনিষ্ঠতা, বিনয়, বদান্যতা, কৃতজ্ঞতা, সন্তানের তরবীয়ত, শিক্ষা এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদাচারণ করা-ইত্যাদি বিষয়ে প্রাঞ্জল বর্ণনা। এই প্রসঙ্গে জামাতের সদস্যবর্গকে হুযুর (সা.)-এর আদর্শ গ্রহণ করার প্রতি তাকিদি নির্দেশ

খোদা করুক আমরা যেন কেবল মৌখিক দাবীর দ্বারা নয় বরং আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সঠিক আমলকারী হই এবং তাঁর অনুগত হয়ে নিজেদের মুক্তির উপকরণ তৈরী করতে সক্ষম হই।

কাদিয়ানের দারুল আমানে জামাত আহমদীয়ার আন্তর্জাতিক সালানা জলসা উপলক্ষ্যে ২৮ শে ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে লন্ডনের তাহের হল থেকে এম.টি.এ-র যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরাসরি প্রদত্ত হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমাপনী ভাষণ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (آل عمران:32)

আমরা যদি চাই যে, আল্লাহ তা'লার নৈকট্য অর্জিত হোক, আল্লাহ্ তা"লা আমাদের দোয়া গ্রহণ করুক, আমাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা সৃষ্টি হোক, তবে এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি নীতি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন এই সমস্ত বিষয় তোমরা তখনই অর্জন করতে পারবে যখন তোমরা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শ অনুযায়ী নিজেদের পরিচালিত করবে, এবং তাঁর আদর্শকে বোঝার জন্য, সেই আদর্শবলীর উপর অনুশীলন করার জন্য এটিও আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ যে, তিনি সাহাবা (রা.) গণের মাধ্যমে সেই সকল আদর্শ আমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন যেগুলির উপর মহানবী (সা.) আমল করতেন। কিন্তু একথাও অনুধাবন করা আবশ্যক যে মহানবী (সা.) কেবল সেই সমস্ত কাজ করতেন এবং কথা বলতেন যেগুলি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) কে মহানবী (সা.)-এর চরিত্র এবং কর্মবিধি সম্পর্কে জিজ্ঞসা করা হলে তিনি (রা.) সুন্দরভাবে কেবল তিনটি শব্দ দ্বারা তাঁর আদর্শ বর্ণনা করেন। كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآن (মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৪) অর্থাৎ তাঁর চরিত্র এবং কর্মবিধি সেটিই যা কুরআনের মত মহানগ্রন্থ নিজের মধ্যে সমাবিষ্ট রেখেছে। এযুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের উপর আরও একটি অনুগ্রহ করে নিজের প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ,আঁ হযরত (সা.)-এর একনিষ্ঠ সেবক দাস এবং যুগের ইমাম মসীহ মওউদ ও মাহদী মাহুদকে প্রেরণ করেছেন যিনি আমাদেরকে নবীদের প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মান এবং বিশেষ করে আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর আদর্শ সম্পর্কে আরও বেশি ব্যুতপত্তি দান করেছেন।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন: " স্মরণ রাখা উচিত যে, আম্বিয়া, রসুল এবং যুগের ইমামদের আগমণের উদ্দেশ্য কি? তাঁরা পৃথিবীতে নিজেদের পুজো করানোর জন্য আসেন না। তাঁরা এক-অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তাঁদের আগমণের উদ্দেশ্য এটিই যে মানুষ যেন তাঁদের নমুনাকে অনুসরণ করে এবং তাঁদের ন্যায় হওয়ার চেষ্টা করে এবং এমনভাবে অনুসরণ করে যেন মানুষ তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, কিছু মানুষ তাদের আগমণের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে তাদেরকে খোদা মনে করে বসে। এহেন কর্মে ইমাম ও রসূলগণ প্রীত হতে পারেন না যে মানুষ তাদের এমন উচ্চ মর্যাদা প্রদান করুক । কখনোই নয়। তাঁরা এটিকে কোন আনন্দের কারণ বলে গণ্য করেন না। মানুষ তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুক এবং তাদের আনীত শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হোক, তাঁদের প্রকৃত আনন্দ এরই মধ্যে নিহিত। অর্থাৎ প্রকৃত খোদার ইবাদত করা এবং একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সুতরাং আঁ হযরত (সা.)-এর উপরও এই আদেশ অবতীর্ণ হয়-قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (আলে ইমরান: ৩২) অর্থাৎ হে রসুল তুমি তাদেরকে বলে দাও! যদি তোমরা চাও যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসুক তবে আমাকে অনুসরণ কর। এই অনুসণের পরিণামে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে ভালবাসবেন।" তিনি বলেন, এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়ভাজন হওয়ার পদ্ধতি হল, রসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রকৃত আনুগত্য। অতএব এই কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, আম্বিয়া (আ.) এবং অনুরূপভাবে খোদা তা'লার অন্যান্য সত্যান্বেষীগণ পৃথিবীতে একটি নমুনা স্বরূপ আগমণ করেন। যে ব্যক্তি এই নমুনা অনুসারে চলার চেষ্টা করে না কিন্তু তাদেরকে সিজদা করে এবং চাহিদাপুরণকারী রূপে মেনে নিতে প্রস্তুত হয় খোদা তা'লার নিকট তার কোন মূল্য নেই বরং মৃত্যুর পর সে দেখবে যে সেই ইমাম তার সম্পর্কে উদাসীন।"
(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮৮-২৮৯)

অতএব আম্বিয়াগণ প্রথম বিষয় যা মানুষকে শিখিয়ে থাকেন এবং মহানবী (সা.) যার পরম মার্গে অধিষ্ঠিত সেটি হল একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা। মহানবী (সা.) এই একত্বাবাদই তাঁর মান্যকারীদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত আমরা তাঁর সাহাবাগণের মধ্যে লক্ষ্য করি। সাহাবাগণ সরাসরি মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হয়েছেন। সাহাবগণ তাঁর (সা.) বান্দেগীর মর্যাদা এবং একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর ব্যাকুলতা প্রত্যক্ষ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে তাঁর ভালবাসা এবং ইবাদতের মান তাঁরা দেখেছেন। এর ফলে তাদের মধ্যেও প্রকৃত একত্ববাদের প্রেরণা জন্ম

নিয়েছে। যেরূপ আমি বলেছি, আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শ আমাদের নিকট পৌঁছে দিতে সাহাবাগণেরও অবদান আছে বরং এটি আমাদের প্রতি তাদের অনুগ্রহ। কয়েকটি ঘটনা উপস্থাপন করছি।

একবার হযরত উমর (রা.) তাঁর পিতার শপথ নিচ্ছিলেন। বিষয়টি আঁ হযরত (সা.)-এর কর্ণগোচর হয়। তিনি (সা.) বলেন, দেখ! আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে পিতার শপথ নিতে নিষেধ করেছেন। যার কসম বা শপথ নেওয়ার নেওয়ার প্রয়োজন হয় সে যেন আল্লাহ্র কসম খায় অথবা নীরব থাকে। (সহী বুখারী, কিতাবুল আদাব)। অতএব আল্লাহ্ তা'লা ব্যতীত কারোর কসম খাওয়া বৈধ নয়। অনেকে নিজ সন্তানের, প্রিয়জন বা নিকটাত্মীয়ের কসম খেয়ে বসে। এবং মনে করে যে, এরা যেহেতু আমাদের প্রিয়জন তাই এদের নামে কসম খেলে অপরপক্ষ বিশ্বাস করে নিবে। কিন্তু একজন মোমিনের সবসময় স্মরণ রাখা উচিত যে, এই কাজটি তৌহিদ বা একত্ববাদ থেকে দূরে নিয়ে যায়।

একবার একজন প্রশ্নকর্তা বলেন, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.) কেউ যুদ্ধ করে নিজের আত্মাভিমানের জন্য, কেউ বা নিজের বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য আবার কেউ বা মালে গনীমত বা লুঠের মাল লাভের জন্য। এদের মধ্যে জিহাদকারী কে? মহানবী (সা.) উত্তর দিলেন: যে ব্যক্তি এই কারণে যুদ্ধ করে যেন আল্লাহ্র বাণী মুখরিত হয় এবং একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র পথে প্রকৃত জিহাদকারী বলে গণ্য হবে। (সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)

অতএব প্রত্যেক সেই কর্ম যা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পাদিত হয় সেটিই আল্লাহ্ তা'লার নিকট পছন্দনীয় এবং এই কাজের জন্যই আঁ হযরত (সা.) আবির্ভুত হয়েছিলেন।

একবার মক্কার সর্দাররা আঁ হযরত (সা.)কে আলোচনার জন্য ডাকেন। আঁ হযরত (সা.) মনে করেন যে, হয়তো তারা কোন ধারণার বশবর্তী হয়ে সঠিক পথ অবলম্বনের জন্য মনস্থির করেছেন। সুতরাং তিনি (সা.) অনতিবিলম্বে সেখানে পৌঁছে যান। মক্কার সর্দাররা সর্বসম্মতিক্রমে বললেন, হে মহম্মদ! (সা.) আমরা আপনাকে আলোচনার জন্য ডেকেছি। আরবদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিকে জানি না যে নিজের জাতিকে এমন বিপাকে ফেলেছে যেরূপ আপনি আমাদেরকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছেন। আপনি আমাদের উপাস্যগণকে গালি দেন। আপনি আমাদের দলের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এমন কোন বিশৃঙ্খলা নেই যা আপনার কারণে সৃষ্টি হয় নি। (অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিতে, জাগতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে যে সব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিল। বস্তুতঃ তিনি তো পৃথিবীর সংশোধনের জন্যই আবির্ভুত হয়েছিলেন। তারা বলল-) যদি ধন-সম্পদ অর্জন করা আপনার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তবে আমরা আপনাকে এত পরিমাণ ধন-সম্পদ দিব যে আপনি আমাদের মধ্যে ধনীতম ব্যক্তি হয়ে উঠবেন। যদি আপনার সর্দার হওয়ার বাসনা থাকে তবে আমরা আপনাকে সর্দার রূপে স্বীকার করছি। তিনি (সা.) বললেন, তোমরা আমাকে ভুল বুঝেছ। এমন আকাঙ্খা আমার মধ্যে নেই। আমি জাগতিক খ্যাতি ও সম্মান চাই না। খোদা তা'লা আমাকে রসুল করে পাঠিয়েছেন। আমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং আদেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হয়ে তোমাদেরকে সুসংবাদও দিই এবং সতর্কও করি। আমি যেন একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করি। অতএব আমি তোমাদের নিকট খোদা তা'লার বাণী পৌঁছে দিয়েছি। যদি তোমরা এটি গ্রহণ কর তবে এতে তোমাদের নিজেদের মঙ্গল। আর যদি তোমরা গ্রহণ না কর তবে তোমরা সেই দিন পর্যন্ত অপেক্ষা কর আর আমিও অপেক্ষা করছি যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদা তা'লা আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন। এরপর বিশ্ববাসী দেখেছে যে, কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের মধ্যে মীমাংসা করেছেন এবং কীভাবে একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। (সীরাত ইবনে হিশশাম)

আঁ হযরত (সা.)-এর বান্দেগীর উল্লেখ করে সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: " কুরআন করীম পাঠ করে দেখ, শুধু তাই নয়, আমাদের নবী করীম (সা.) থেকে শ্রেষ্ঠ পৃথিবীতে কোন পূর্ণ মানবের নমুনা বিদ্যমান নেই আর ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্তও হবে না। এরপর দেখ, মোজেযা দেখানোর শক্তি লাভ হওয়া সত্বেও হুযুর (সা.) সব সময় পরম বিনয়ী থেকেছেন। এবং বার বার কেবল বলে এসেছেন 'ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলিকুম' (আল-কাহাফ: ১১১) অর্থাৎ নিশ্চয় আমি তোমাদের মতই মানুষ' । এমনকি কলেমায়ে তৌহিদে তাঁর বান্দা হওয়ার স্বীকারোক্তীকে অনিবার্য অংশ বলে গণ্য করেছেন। যেটি ছাড়া একজন মুসলমান মুসলমানই থাকতে পারে না। ভেবে দেখ! আরও একবার ভেবে দেখ! যে পরিস্থিতিতে পূর্ণ পথ-প্রদর্শনকারীর জীবনযাপন পদ্ধতি আমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করছে যে, নৈকট্যের পরম মার্গে উপনীত হয়ে নিজের বান্দা হওয়াকে অস্বীকার করেন নি, তবে অন্য কারোর বিষয়ে এমন ধারণা করা এবং এমন কথাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়াই বৃথা।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৭-১১৮)

অতএব এই ব্যুতপত্তি ও তত্বজ্ঞান হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে দিয়েছেন যে, যখন একজন মুসলমান এই ঘোষণা করে যে, اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه তখন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ও রাসুলুহ' ঘোষণাও আবশ্যক। অতএব পূর্ণ নবী যখন আল্লাহ্র বান্দা হতে পারেন তবে সেই সমস্ত মানুষের কাজকে কিভাবে বৈধতা দেওয়া যেতে পারে যারা পীর ও ফকিরদেরকে এর থেকে বেশি মর্যাদা দিয়ে তাদের কবরে সিজদা করে। বরং এটি ভয়ানক পাপ এবং শির্ক। এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে মান্য করার তৌফিক দান করেছেন যিনি আমাদেরকে একত্ববাদ সম্পর্কে মৌলিক যুক্তি ও জ্ঞান এবং আঁ হযরত (সা.) -এর বান্দা হওয়ার সঠিক ব্যুতপত্তি দান করেছেন এবং আমাদের যাবতীয় শিরক থেকে পবিত্র করেছেন।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন:

" আমি সর্বদা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করি যে,এই যে আরবী নবী যাঁর নাম 'মুহাম্মদ' (তাঁর প্রতি হাজার হাজার দরুদ ও সালাম), তিনি কতই না উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর উচ্চ অবস্থান বা মোকামের সীমা কল্পনাও করা যায় না এবং তাঁর পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ও কার্যকারিতার সঠিক অনুমান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আফসোস যে, তাঁর মর্যাদা যেভাবে সনাক্ত করা উচিত ছিল, সেভাবে সনাক্ত করা হয় নি। সেই তওহীদ যা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তিনিই একমাত্র বীরপুরুষ, তা দুনিয়াতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষের প্রতি ভালবাসায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। এজন্যই খোদা, যিনি তাঁর (সা.) হৃদয়ের রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সমস্ত নবী ও সমস্ত প্রথম ও শেষের ব্যক্তিগণের অর্থাৎ আউয়ালীন ও আখেরীনদের উপরে উন্নীত করেছেন। এবং তাঁর কাঙ্খিত সকল প্রত্যাশাই তাঁর জীবনে পূর্ণ করে দিয়েছেন। "

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন,পৃষ্ঠা: ১১৮-১১৯)

একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা সেই সময় সম্পূর্ণ হয় যখন মানুষ আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের অধিকারও পুরণ করে এবং এক্ষেত্রেও আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ (সা.) উচ্চতম মর্যাদা অর্জন করেছেন আল্লাহ্ তা'লা যেটি সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, اَلَّذِيْ يَرٰكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ (আশ-শোয়রা: ২১৯-২২০) অর্থাৎ যিনি তোমার দণ্ডায়মান হওয়া দেখেন সেজদাকারীদের মধ্যে তোমার ব্যকুলতা প্রত্যক্ষ করেছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা এই ঘোষণা দিচ্ছেন যে, হে মহম্মদ! (সা.) সমস্ত সেজদাকারীদের মধ্যে তোমার ন্যায় ব্যাকুলভাবে সেজদকারী কেউ নেই। তুমি একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিষ্ঠাবানদের এমন এক জামাত তৈরী করেছ যারা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের ক্ষেত্রে অনবদ্য, যাদের রাত্রিগুলি ইবাদতের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। কিন্তু এই সমস্ত ইবাদত ও সেজদাগুলি ছিল তোমার সেজদার নমুনাকে আত্মস্থ করার প্রচেষ্টা। এই সকল সেজদার ব্যাকুলতায় যেখানে আমরা আঁ হযরত (সা.)-এর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য আকুলতা দেখতে পাই সেখানে আমরা এও লক্ষ্য করি যে, তিনি (সা.) তাঁর মান্যকারীদের মধ্যে এমন সেজদাকারীর জামাত তৈরী করতে চেয়েছিলেন যারা একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহ্র সম্মুখে নতজানু হবে এবং তাঁরই ইবাদত করবে। যারা হৃদয়ে ঘর করে বসা উপাস্যগুলিকে বের করে দিবে। আঁ হযরত (সা.) একবার বলেন: প্রত্যেক নবীর কোন না কোন বাসনা থাকে। আমার বাসনা হল রাতের ইবাদত। (কুনযুল আমাল, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩২৩) একজন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন যে, আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-কে নামায পড়তে দেখেছি। সেই পরম অনুনয়-বিনয়ের মূহুর্তে তাঁর বক্ষদেশ থেকে এমন শব্দ নির্গত হচ্ছিল যেরূপে জাঁতাকল থেকে শব্দ উৎপন্ন হয়।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুর রুকু ওয়াস সুজুদ)

অনুরূপভাবে আরও একটি বর্ণনায় আছে, এমন শব্দ হচ্ছিল যেন হাঁড়িতে পানি ফুটছিল। " (সুনান আন নেসাঈ, কিতাবুস সাহু)

হযরত উম্মে সালমা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) কিছু সময় ঘুমাতেন এবং এরপর ঘুম থেকে উঠে কিছু সময় নামাযে ডুবে থাকতেন। এরপর তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন এবং পুনরায় জেগে যেতেন। মোটকথা সকাল পর্যন্ত এমনটিই চলতে থাকত।(সুনান আন নিসাঈ, কিতাবুল কিয়ামুল লাঈল)

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে যদি তাহাজ্জুদের নামায না পড়তেন, তবে তিনি (সা.) দিনের বেলায় বারো রাকাত নফল নামায পড়তেন।

(সুনান আন নিসাঈ, কিতাবুল কিয়ামুল লাঈল)

আঁ হযরত (সা.) তাঁর মান্যকারীদের জন্যও এই একই প্রত্যাশা করতেন যে, তারা যেন ইবাদতকারী হয় এবং সঠিক অর্থে ইবাদত করে।

আঁ হযরত (সা.)-এর বাসনা ছিল তাঁর উম্মতের মানুষদের ইবাদতের মান যেন উচ্চ হয়। তাঁর এই মনোবাঞ্ছার প্রভাবে হযরত আয়েশা (রা.) একবার উপদেশ দান করতে গিয়ে বলেন, কখনো রাতের নামায ত্যাগ করো না। কেননা রসূলুল্লাহ (সা.) এটি ত্যাগ করতেন না। যখন তিনি অসুস্থ হতেন, শরীর সঙ্গ দিত না তখন তিনি বসে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন । (মসনদ আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২২২-২২৩)

আমি যে বর্ণনাটি এখন পাঠ করলাম অর্থাৎ যদি তাহাজ্জুদ নামায বাদ পড়ে গেলে তিনি (সা.) দিনের বেলায় ১২ রাকাত নামায পড়ে নিতেন-এমন ঘটনা হয়তো বিরলই ছিল। নচেত তিনি (সা.) একবার অসুস্থ অবস্থাতেই দুর্বলতা সত্বেও রাতের নামাযে দীর্ঘ সূরা পাঠ করেছেন। তাঁর অসুস্থতার লক্ষণ সাহাবীগণও তাঁর শরীর ও চেহারার মধ্যে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করছিলেন। (কুনযুল আমাল, ২ য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৩) সমস্ত দোয়া এবং ইবাদতে তিনি (সা.) এ বিষয়ের উপরই গুরুত্ব দিতেন যে, তাঁর উম্মত যেন প্রকৃত ইবাদতকারী হয় এবং নিজ প্রভু খোদার সম্মুখে নতজানু হয়ে থাকে। তাঁর সাহাবাগণ এই ব্যাকুলতা লক্ষ্য করেছিলেন এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভ থেকে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তারা মহানবী (সা.)-এর আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন। যারা মুশরিক ছিলেন এমন ইবাদতকারীতে পরিণত হলেন যে, আগত প্রজন্মের জন্য নমুনা হয়ে থাকলেন। তাদের মধ্যে এক বিপ্লব সাধিত হল।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

" আমি দাবীর সঙ্গে বলছি, যতই ঘোর শত্রু হোক না কেন, সে খৃষ্টান হোক বা আর্য, যখন তারা আঁ হযরত (সা.)-এর পূর্বে আরবদের অবস্থাকে দেখবে এবং সেই পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টিপাত করবে যা আঁ হযরত (সা.)-এর শিক্ষা এবং প্রভাবের কারণে সৃষ্টি হয়েছিল, তখন সে অবলীলাক্রমে মহানবী (সা.)-এর সত্যতার প্রতি সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হবে। মোটকথা, কুরআন করীম প্রাথমিক যুগের যে রূপরেখা অঙ্কন করেছে يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ (মুহাম্মদ: ১৩) (অর্থাৎ পশুর ন্যায় আহার করাই ছিল তাদের কর্ম) এটি তো ছিল তাদের কুফরের অবস্থা। অতঃপর আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র প্রভাব তাদের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করার ফলে তাদের অবস্থা দাঁড়াল এই যে তারা নিজ প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে সিজদারত এবং দন্ডায়মান অবস্থায় নিজেদের রাত্রি যাপন করত। (আল ফুরকান: ৬৫) আঁ হযরত (সা.) আরবদের পশুতুল্য মানুষদের মধ্যে যে পরিবর্তন সাধন করেছিলেন এবং যে অতল গহ্বর থেকে উদ্ধার করে তাদেরকে এমন উচ্চতর মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছিলেন-এই সমস্ত অবস্থার রূপরেখা দেখার পর মানুষ আবেগতাড়িত হয়ে কেঁদে ফেলে। কেননা এটি এমন এক অসাধারণ বিপ্লব ছিল যা তিনি (সা.) সাধন করেছিলেন। পৃথিবীর কোন ইতিহাসে এবং কোন জাতির মধ্যে এমন নজির পাওয়া যেতে পারে না। (মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৪-১৪৫)

এটি নিছক কাহিনী নয়। এগুলি বাস্তব ঘটনা, সকলকেই যেগুলির সত্যতা অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এই যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এক আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছেন। অতএব নিজেদের ইবাদতের মানকে উচ্চতর করা এবং কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী সেই আদর্শের উপর পরিচালিত হওয়াও আমদেরই কাজ।

নফল প্রসঙ্গে আমি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছি। যখন নফল সম্পর্কে এই নির্দেশনা আছে এবং এত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে তখন ফরয নামাযের জন্য কিরূপ নিয়মনিষ্ঠতা দেখানো আবশ্যক! অতএব আমাদের প্রত্যেকের আত্ম-পর্যালোচনা করা এবং এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করা জরুরী।

আম্বিয়াগণ পৃথিবীতে আগমণ করেন সত্যের প্রসারের উদ্দেশ্যে, নিজের অনুসারীদেরকে সত্যের উপর চালিত করার উদ্দেশ্যে এবং সত্য খোদার দিকে নতজানু করতে। এক্ষেত্রেও মহানবী (সা.)-কে উচ্চতম স্থান প্রদান করা হয়েছে। আশৈশব তাঁর মধ্যে এই গুণ এমন প্রকট ছিল যে, শত্রুরাও তাঁর সত্যতাকে স্বীকার করেছে। একবার কুরায়েশদের সর্দাররা একটি স্থানে সমবেত হয়েছিল যাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘোর বিরোধী আবু জাহল এবং নাযার বিন হারিসও ছিল। যখন মহানবী (সা.) সম্পর্কে বলা হল যে, তাঁকে জাদুগর ও মিথ্যাবাদী অপবাদ দিয়ে তাঁর কুখ্যাতি ছড়িয়ে দেওয়া হোক। তখন নাযার বিন হারিস উঠে দাঁড়িয়ে বললেন হে কুরায়েশ! এমন একটি বিষয় তোমাদের সামনে এসে পড়েছে যার মোকাবেলা করার জন্য তোমরা কোন পরিকল্পনাও তৈরী করতে পার নি। মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের মধ্যে যুবক ছিলেন এবং তোমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন। সব থেকে বেশি সত্যবাদী ছিলেন। তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ছিলেন। এখন তাঁর চুল সাদা হতে শুরু করেছে। (বয়স বেড়েছে) যে বাণী তিনি নিয়ে এসেছেন তার কারণে তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলছ, তাঁকে জাদুকর বলছ। আমরা মিথ্যাবাদীও দেখেছি, জাদুকরও দেখেছি। তোমরা তাঁকে গণক অপবাদ দাও, আমি গণকও দেখেছি। তোমরা তাঁকে কবি আখ্যা দিয়েছ। আমি কবিও দেখেছি। তোমরা তাকে উন্মাদ বলেছ। (নাউযুবিল্লাহ্) আমি উন্মাদও দেখেছি। না তিনি মিথ্যাবাদী, না তিনি জাদুকর, না তিনি গণক আর না তিনি কবি বা উন্মাদ। এগুলির কোনও লক্ষণই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান নয়। অতএব তোমরা ভেবে দেখ! তোমাদের মোকাবিলা একটি অসাধারণ বিষয়ের সঙ্গে। (সীরাত ইবনে হিশশাম) এটি ছিল শত্রুর উক্তি।

একবার আবু জাহল মহানবী (সা.)-এক সম্বোধন করে বলল, আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছি না, আমি তোমার শিক্ষাকে মিথ্যা বলে মনে করি। (সুনান তিরমিযী, আবওয়াবুত তাফসীরুল কুরআন) আঁ হযরত (সা.) বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে এতকাল ছিলাম, কিন্তু কখনো আমার মিথ্যা প্রমাণ করতে পার নি। আমাকে কখনো মিথ্যাবাদী বলতে পার নি। আজকে এই শিক্ষা আনার কারণে খোদা তা'লার বিষয়ে আমি মিথ্যা বলব?

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: " আম্বিয়া হলেন তাঁরা যাঁরা নিজেদের পূর্ণ সত্যের শক্তিশালী দলিল উপস্থাপন করে শত্রুদেরকেও অভিযুক্ত করেছে, যেরূপ হযরত খাতামুল আম্বিয়া মহম্মদ (সা.)-এর পক্ষ থেকে এই অভিযোগ কুরআন শরীফে বিদ্যমান, যেখানে তিনি (সা.) বলেছেন, 'ফাকাদ লাবিসতু ফিকুম উমারাম মিন কাবলিহি আফালা তাকেলুন' (সূরা ইউনুস: ১৭) অর্থাৎ আমি মিথ্যা বলছি না। দেখ! এর পূর্বে আমি চল্লিশ বছর তোমাদের মধ্যে থেকেছি। তোমরা কি কখনো আমাকে মিথ্যাবাদী পেয়েছ? মোটকথা আম্বিয়াগণের জীবনী এমনই স্পষ্ট এবং প্রমাণসিদ্ধ যে, যদি সমস্ত বিষয়কে একপাশে রেখে কেবল যদি তাদের ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় তবে তাদের সত্যতা তাদের ঘটনাবলী থেকেই দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ যদি কোন ন্যায়পরায়ণ এবং বিবেকবান মানুষ হযরত খাতামুল আম্বিয়ার নবুয়তের সত্যতার এই সমস্ত দলিল উপেক্ষা করে কেবল তাঁর সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলীর প্রতিই গভীরভাবে দৃষ্টি দেয়, তবে নিঃসন্দেহে ঐ সকল ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণ করেই সে তাঁকে অন্তর থেকে সত্য নবী হিসেবে বিশ্বাস করবে। আর কেনই বা সে করবে না? সেই সকল ঘটনাবলী এমনই পূর্ণ সত্যতা এবং স্বচ্ছতা দ্বারা সুরভিত যে, সত্যান্বেষীদের হৃদয় অনায়াসে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০৭-১০৮)

শৈশবকালও তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে। তাঁর যৌবনকালও সাক্ষ্য দেয় এবং নবুয়তের পর এটি পরম উৎকর্ষতা লাভ করে। অতএব এই নবীর মান্যকারীদের আত্ম-বিশ্লেষণ করা উচিত যে, আমাদের সত্যতার মান কি হওয়া উচিত।

আঁ হযরত (সা.)-এর আরও একটি গুণ বিনয় ও নম্রতার উচ্চ মান সম্পর্কে উল্লেখ করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন: " দেখ! যদি আমাদের নবী (সা.)-এর সফলতা এমন পর্যায়ের ছিল যে, পূর্বের সমস্ত নবীদের মধ্যে তার তুলনা পাওয়া যায় না। কিন্তু খোদা তা'লা তাঁকে যত বেশি সফলতা দান করেছেন, তিনি (সা.) ততই বিনম্রতা অবলম্বন করতে থেকেছেন। একবার এক ব্যক্তিকে তাঁর সমীপে বন্দী করে নিয়ে আসা হল। তিনি (সা.) লক্ষ্য করলেন সেই ব্যক্তি ভীত-ত্রস্ত হয়ে কেঁপে চলেছিল। কিন্তু যখন সে নিকটে এল তিনি (সা.) অত্যন্ত বিনম্রতার সাথে তাকে বললেন, তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? আমিও তো তোমারই মত একজন মানুষই বটে এবং এক বৃদ্ধার সন্তান। "(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৫৮)

একটি হাদীস থেকে আঁ হযরত (সা.)-এর বিনম্রতা সম্পর্কে জানা যায় এবং এর মধ্যে তাঁর মান্যকারীদের উদ্দেশ্যে উপদেশও রয়েছে যে, কীভাবে তাদের জীবন যাপন করা উচিত।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে কেউই নিজের কর্মের সুবাদে নাজাত লাভ করবে না। সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, হে রসূলুল্লাহ (সা.)! আপনিও? তিনি (সা.) বললেন, হ্যাঁ আমিও নিজের কর্মের কারণে নাজাত লাভ করব না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে স্বীয় রহমতের ছায়ায় আবৃত করবেন। তিনি (সা.) বলেন, অতএব তোমরা যদি সরল পথে পরিচালিত হও, শরীয়তের নিকটবর্তী

থাক, সকাল, সন্ধ্যা ও রাত্রি বেলা ইবাদত কর এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন কর তবে তোমরা নিজেদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাবে।(সহী বুখারী, কিতাবুর রিফাক)

অতএব যে নবী সম্পর্কে খোদা তা'লা বলেছেন যে, তাঁর বয়াত করার অর্থ হল আমার বয়াত করা এবং তাঁর হাত হল আমার হাত, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ভয় এবং বিনয়ের অবস্থা দেখুন! তিনি বলেন, আমিও তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহ বশতঃই মুক্তি লাভ করব। তিনি (সা.) আরও বলেন, তোমরা নিজেদের কর্মের উপর দৃষ্টি রাখ। নিজেদের ইবাদতের উপর দৃষ্টি রাখ এবং খোদা সম্পর্কে কখনো উদাসীন হয়ো না। কখনো ইবাদত সম্পর্কে অবহেলা করো না।

এরপর সফলতা ও বিজয় লাভ করার সময় মহানবী (সা.)-এর বিনয় প্রদর্শনের চিত্রটি দেখুন। জাগতিক নেতারা সফলতা অর্জন করলে ফেরাউন হয়ে ওঠে। বরং সাধারণ মানুষও যদি কোন সফলতা পায় তবে গর্ব ও অহঙ্কারে তারা বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। কিন্তু পূর্ণ মানবের আদর্শ দেখুন! সেই শহর যার বাসিন্দারা তাঁকে এবং তাঁর মান্যকারীদেরকে নির্যাতন করে বের করে দিয়েছিল এবং সেখানেই তারা থেমে থাকে নি বরং পরবর্তীতেও তারা ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য অবিরাম চেষ্টা করে গেছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র লিখনই ভবিতব্য ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার নিয়তীক্রমে অবশেষে মক্কা বিজয়ের মূহুর্ত এসে পড়ল। তিনি এই শহরে বিজয়ী রূপে প্রবেশ করলেন। কিন্তু কেমন অবস্থায়? ইতিহাস বর্ণনা করে, মহানবী (সা.) যেদিন দশ হাজার কুদ্দুসীর সাথে বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন, (সীরাত ইবনে হিশশাম) সেটি তাঁর জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও মহত্ব প্রকাশের দিন ছিল। কিন্তু মহানবী (সা.) খোদার এই সকল কৃপারাজি প্রকাশের জন্য খোদার পথে বিনয়ের পরম মার্গে উপনীত হলেন। খোদা তা'লা তাকে যত বেশি উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করলেন, তিনি (সা.) ততই বিনম্র হতে থাকলেন, এমনকি তিনি (সা.) যখন বিজয়ী রূপে মক্কায় প্রবেশ করছিলেন তখন তাঁর মস্তক নত হতে হতে উঁটের পেটে গিয়ে স্পর্শ করে। (সীরাত ইবনে হিশশাম)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই ঘটনাটিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "বিজয় ও মহত্ব যা আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ বান্দাকে দেওয়া হয়ে থাকে সেটি বিনয় আকারে হয়ে থাকে এবং শয়তানের বিজয় অহংকারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে।" শয়তান অহংকার করে। " আমাদের নবী (সা.) যখন মক্কা বিজয় করলেন, তখন তিনি এমন ভাবে নতমস্তক হলেন এবং সিজদা করলেন যেভাবে বিপদ ও দুর্যোগের সময় তিনি (সা.) সিজদারত হতেন যখন এই মক্কাভূমিতেই বিভিন্ন উপায়ে তাঁর বিরোধীতা করা হত এবং তাঁকে নির্যাতন করা হত।" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৫)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আঁ হযরত (সা.)-এর বিনয় সম্পর্কে উল্লেখ করে উপদেশ করেন: " কেবল মিথ্যা আস্ফালন ও অনর্থক অহংকার প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকা উচিত এবং বিনয় অবলম্বন করা উচিত। আমাদের নবী (সা.) বস্তুতঃ যিনি সব থেকে বড় বুযুর্গ ছিলেন তাঁর বিনয়ের নমুনা কুরআন শরীফে বিদ্যমান। লিখিত আছে যে, একজন জন অন্ধ আঁ হযরত (সা.) -এর কাছে কুরআন শরীফ পড়ত। একদিন মহানবী (সা.)-এর কাছে মক্কার প্রমূখ নেতা ও সর্দাররা একত্রিত হয়ে কথাবার্তা আরম্ভ করল এবং তিনি (সা.) তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ব্যস্ততার কারণে কিছুটা বিলম্ব হলে সেই অন্ধ ব্যক্তি সেখান থেকে চলে যায়। এটি একটি তুচ্ছ বিষয় ছিল। আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়ে একটি সুরা অবতীর্ণ করলেন। এরপর আঁ হযরত (সা.) সেই ব্যক্তির বাড়ি গিয়ে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে নিজের চাদর বিছিয়ে তার উপর বসতে দিলেন। বস্তুতঃ যাদের হৃদয়ে খোদা তা'লার মহত্ব থাকে তাদেরকে আবশ্যিকভাবে বিনয়ী হতে হয় কেননা তারা খোদা তা'লার উদাসনীতা সম্পর্কে সব সময় ভীত থাকে। " এর তিনি (আ.) একটি ফার্সি পঙক্তি বর্ণনা করেন যার অর্থ হল- " যারা আরিফ (মারেফাতের জ্ঞান প্রাপ্ত), যারা খোদা তা'লা সম্পর্কে বেশি জ্ঞান রাখেন তারা বেশি ভয় করে। কেননা যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেন অনুরূপে তিনি সূক্ষ্ম বিষয়ে গ্রেপ্তারও করেন। যদি তিনি কোন কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে যান তবে নিমেষেই সমস্ত কিছু ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। অতএব তোমাদের উচিত এবিষয়ে ভেবে দেখা, এ বিষয়টিকে স্মরণ রাখা এবং এর উপর আমল করা"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪৩-৩৪৪)

আঁ হযরত (সা.)-এর গুণাবলীর সৌন্দর্য্য প্রত্যেকটি বৈশিষ্টকে পরিবেষ্টন করে আছে। সবগুলি একটি মজলিসে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, কয়েকটি মজলিসে বর্ণনা করাও সম্ভব নয়। এখন আমি তাঁর গুণাবলীর একটি আঙ্গিক সম্পর্কে বর্ণনা করব সেটি হল তাঁর বদান্যতা ও উদারতা।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আঁ হযরত (সা.)-এর থেকে উত্তম বীর, সম্মানীয়, মহানুভব ও জ্যোতির্ময় ব্যক্তি দেখি নি। (সুনানুদ দারামী) প্রতীত হয়, সাহাবাদের নিকট আঁ হযরত (সা.)-এর গুণাবলী বর্ণনা করার শক্তিই ছিল না। একটি উৎকৃষ্ট গুণ বর্ণনা করার চেষ্টা করলে আরও চারটি গুণাবলী সামনে এসে যায়।

আরও একটি বর্ণনায় আছে যে, আঁ হযরত (সা.)-এর নিকট কয়েকজন আনসার কোন জিনিস চাইলেন। তিনি (সা.) সেটি দিয়ে দিলেন। তারা পুনরায় চাইলেন এবং চাইতে থাকলেন এমনকি তাঁর কাছে যা কিছু ছিল শেষ হয়ে গেল। তিনি (সা.) বললেন, আমার কাছে কোন সম্পদ থাকলে আমি আমি তা আটকে রাখি না। (সহী বুখারী, কিতাবুয যাকাত)

একবার মহানবী (সা.)-এর কাছে কোথা থেকে নব্বই হাজার দিরহাম আসে। তিনি (সা.) সেগুলি সেখানেই বিলিয়ে দেন। (উয়ুনুল আসার, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৮) একবার তিনি একজন যাচনাকারীকে একপাল ছাগল দান করলেন যা পুরো উপাত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। (সহী মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল) একবার তাঁর (সা.)-নিকট বাহরীন থেকে পণ্য নিয়ে আসা হয়। পণ্যদ্রব্যের স্তুপ লেগেছিল। তিনি (সা.) মসজিদের বাইরে সেই পণ্যকে স্তুপীকৃত করে রাখার আদেশ দিলেন। তিনি (সা.) যখন নামায পড়তে আসলেন তখন সেদিকে দৃষ্টি দিলেন না। নামায শেষ করে এসে সেই সমস্ত মালপত্র বিলিয়ে দিলেন। (বুখারী, কিতাবুস সালাত) তাঁর কোমলতা ও বদান্যতার কারণেই বেদুঈনরাও যাচনা করতে গিয়ে অনেক সময় অত্যন্ত অভব্য ও অমার্জিত আচরণ করে বসত। কিন্তু তিনি সমস্ত শক্তির নিয়ন্ত্রক ও প্রশাসক হওয়া সত্বেও তাদের অভব্যতা ও অসৌজন্যমূলক আচরণকে উপেক্ষা করতেন এবং তাদেরকে দান করতেন। (সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)

আম্বিয়া ও আওলিয়াগণ কাঠিন্যের যুগেরও সম্মুখীন হন আবার সাচ্ছন্দ্য ও বিজয়ের যুগও তারা দেখে থাকেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেন: এই দুটি যুগই আবশ্যকীয় যাতে প্রত্যেক অবস্থাতে তাদের আদর্শ জগতের সামনের উন্মোচিত হয়। দুনিয়াদার মানুষ কাঠিন্য ও দুর্বলতার যুগে বিনয় অবলম্বন করে। সমস্যা জর্জরিত হলে খোদা তা'লার দিকেও বিনত হয়। তারা উত্তম আচরণও করে থাকে। সামর্থ্য অনুযায়ী গরীবদেরকে সাহায্যও করে থাকে। তাদেরকে যাতনা দানকারীদেরকে উত্তর দেওয়ার শক্তি না থাকার কারণে নীরব থাকে এবং বলে আমরা ধৈর্য্য অবলম্বন করেছি। কিন্তু যখন তারা শক্তি অর্জন করে সেই সময় মানুষের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া, উত্তম আচরণ করা এবং ক্ষমাশীল হওয়াই প্রকৃত গুণ। অতএব দুর্বলতা এবং শক্তিমত্তা এই দুটি অবস্থাই বস্তুতঃ কারোর উচ্চ নৈতিকতা বিচারের মাপকাঠি। তিনি বলেন, শক্তিমত্তা এবং বিজয়ী হওয়া এই কারণেই জরুরী। কেননা, যাতনা দানকারীদের অপরাধ ক্ষমা করা, শত্রুকে ভালবাসা, মন্দাভিলাষীদের জন্য হিতাকাঙ্খী হওয়া, ধন-সম্পদ থেকে বিমুখতা, সম্পদের অহংকারে মত্ত না হওয়া, সম্পদশালী অবস্থায় কার্পণ্য না করা, বদান্যতা প্রদর্শন করা, সম্পদের প্রাচুর্য্যের কারণে নিজেকে উপাস্য জ্ঞান না করা এবং প্রশাসনিক ক্ষমতাকে জুলুম ও নির্যাতনের অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ না করা- এগুলি এমন সব নৈতিক বিষয় যেগুলি প্রমাণের জন্য সম্পদশালী ও শক্তিশালী হওয়ার শর্ত প্রযোজ্য। এবং এটি তখনই প্রমাণিত হয় যখন মানুষ সম্পদ ও ও শক্তি এই দুইয়েরই অধিকারী হয়। যেহেতু দুর্যোগপূর্ণ যুগ এবং শক্তি ও সামর্থ্যের যুগ ছাড়া এই দুই প্রকারের নৈতিক অবস্থা প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়, এই কারণে খোদা তা'লার পূর্ণ প্রজ্ঞার দাবি হল, আম্বিয়া ও আওলিয়াগণকে এই দুই প্রকার অবস্থা দ্বারা উপকৃত করা যা শত-সহস্র নিয়ামতরাজির সমন্বয়। কিন্তু এই দুই অবস্থা সংঘটিত হওয়ার যুগ প্রত্যেকের জন্য একই ক্রমে আসে না। বরং খোদা তা'লার প্রজ্ঞার অধীনে অনেকের জন্য শান্তি ও সাচ্ছন্দের সময় জীবনের প্রথম যুগে এসে থাকে এবং দুঃখ-কষ্টের যুগ পরবর্তী কালে। আবার কারো কারো জন্য প্রথম যুগে দুঃখ-কষ্ট এসে থাকে এবং শেষ যুগে ঐশী সাহায্য ও সমর্থন প্রাপ্তি ঘটে। কারোর কারোর ক্ষেত্রে এই দুটি অবস্থা প্রচ্ছন্ন থাকে আবার কারোর কারোর ক্ষেত্রে এটি প্রবলভাবে প্রকট হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা হল হযরত খাতামুল আম্বিয়া মহম্মদ (সা.)-এর। কেননা আঁ হযরত (সা.)-এর উপর এই দুটি অবস্থা এমন স্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়েছিল যা উৎকর্ষের পরম পর্যায় ছিল এবং এমন পর্যায়ক্রমে এসেছিল যার ফলে আঁ হযরত (সা.)-এর সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণাবলী দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং এর দ্বারা إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (আল-কালাম: ৫)-এর বিষয়টি প্রমাণ হয়। এবং আঁ হযরত (সা.)-এর চরিত্র উভয় প্রকারে পরম উৎকর্ষতা সহকারে প্রমাণ হওয়া সমস্ত আম্বিয়াগণের চরিত্রকে প্রমাণ করে। কেননা, তিনি (সা.) তাদের নবুয়ত এবং কিতাবসমূহের সত্যায়ন করেছেন এবং তাদেরকে খোদা তা'লার নৈকট্যভাজন রূপে সামনে এনেছেন।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮২-২৮৫)

কৃতজ্ঞতাপরায়ণ হওয়া আরও একটি গুণ যার সঠিক ব্যুতপত্তি এবং পরম মার্গ আমরা আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শে দেখতে পাই। তিনি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতার ক্ষেত্রেও উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং বান্দাদের প্রতিও তাঁর অনুরূপ আচরণ পরিলক্ষিত হয়। তিনি (সা.) দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ ও তোমাকে স্মরণকারী বান্দায় পরিণত কর। (সুনান আবু দাউদ, আবওয়াবুল বিতর) তিনি প্রথম বৃষ্টির প্রথম বিন্দুটি জিহ্বা উপর নিতেন, কেননা আল্লাহ্ তা'লার এই নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এটিই পদ্ধতি। তাঁর আহার ছিল অত্যন্ত সাদামাটা। কিন্তু তাসত্বেও তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। তিনি (সা.)- আমাদেরকে এই দোয়াই শিখিয়েছেন। তিনি (সা.) কখনো একটি খেজুর সহকারে রুটি খাচ্ছেন, তো কখনো কেবল ঝোল সহকারে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন কারণ তিনি এই খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। (সহী বুখারী, কিতাবুল আতইমাহ) তিনি (সা.) নতুন বস্ত্র পরিধান করলেও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। (সুনান তিরমিযী, কিতাবুল লিবাস) মোটকথা, এমন কোন বস্তু নেই যা ব্যবহার করার পূর্বে তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার গুণকীর্তন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন না। যখন তাঁকে (সা.) ইবাদতে অত্যন্ত অনুনয়-বিনয় অবলম্বন করতে দেখে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনি ইবাদত করার জন্য দাঁড়ালে আপনার পা দুটি ফুলে যায়। সেজদায় অত্যন্ত ব্যাকুল থাকেন এবং এত কাঁদেন যে চোখের পানিতে মাটি ভিজে যায়। অথচ আল্লাহ্ তা'লা আপনার পিছনের ও পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। কোন পাপও আপনার দ্বারা সংঘটিত হয় না আর না পূর্বে কখনো হয়েছে। তবে আপনি এত কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন কেন? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে যে এত কিছু দিয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে আমি কি তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে দোয়া করব না? (সহী বুখারী, কিতাব তাফসীরুল কুরআন)

বান্দাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মান কেমন ছিল? হযরত আবু বাকার সিদ্দিক (রা.) মহানবী (সা.)-এর বাল্যকালের বন্ধু ছিলেন যিনি প্রত্যেক কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁর সঙ্গ দিয়েছেন। মহানবী (সা.) তাঁর ভাবাবেগের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিলেন। একবার একব্যক্তি কোন মতভেদের কারণে হযরত আবু বাকার (রা.) কে কিছু বলে ফেলে তখন মহানবী (সা.) সেই ব্যক্তিকে বললেন, যখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে পাঠালেন তখন সকলে আমাকে মিথ্যাবাদী বলল, কিন্তু আবু বাকার আমার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং নিজের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আমার সাহায্য করেছেন। তুমি কি আমার সাথীকে মনোঃপীড়া দেওয়া থেকে বিরত হতে পার না? আরও একটি স্থানে মহানবী (সা.) বলেন, আমার উপর সব থেকে বেশি অনুগ্রহ করেছেন হযরত আবু বাকার (রা.)। (সহী বুখারী, কিতাবুস সালাত)। মহানবী (সা.)-এর উপর কে আর অনুগ্রহ করতে পারে! তাঁর জন্য কিছু উৎসর্গ করা উৎসর্গকারীর জন্য সম্মানের বিষয় ছিল, এছাড়াও বাহ্যিকভাবেও তিনি (সা.) প্রত্যেককে প্রতিদানে অনেক বেশি দিয়েছেন। কিন্তু তাসত্বেও তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

হযরত আয়েশা (রা) আঁ হযরত (সা.)-কে বার বার হযরত খাদীজা (রা.)কে স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা করার কারণে বলতেন, আপনি কেন সব সময় সেই বৃদ্ধার কথা বলেন, অথচ আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে তাঁর থেকে অনেক সুন্দর স্ত্রী দান করেছেন। এর উত্তরে আঁ হযরত (সা.) বললেন, যখন সকলে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তখন তিনি (রা.) আমাকে গ্রহণ করেছিলেন। যখন মানুষ আমাকে অস্বীকার করল তখন তিনি ঈমান এনেছিলেন। যখন আমাকে ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হল, তখন তিনি আমাকে নিজের ধন-সম্পদ দিয়ে আমার সাহায্য করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তাঁর মাধ্যমেই সন্তান দান করেছেন। (আসাদুল গাবা, ৭ম খণ্ড)। মহানবী (সা.) হযরত খাদীজা (রা.)-এর সেই সব সেবাকে কখনো ভুলেন নি যা তিনি (রা.) একজন স্ত্রী হিসেবে স্বামীর জন্য করেছিলেন। সেগুলিকে তিনি (সা.) অনুগ্রহ মনে করতেন এবং আজীবন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। বর্তমান যুগের স্বামীদের জন্য এটি একটি শিক্ষনীয় বিষয়। কেননা তারা স্ত্রীর সম্পদও আত্মসাত করে উপরন্তু তাদেরকে বলে যে, এখনও তাদেরকে অনুগ্রহ বশতঃ স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে রেখেছে।

এছাড়াও মহানবী (সা.) ইথিওপিয়ার নাজাশী বাদশাহ্র অনুগ্রহকে সবসময় কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ রাখতেন , যিনি কুফ্ফারদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হিজরতকারী মুসলমানদেরকে নিজের দেশে আশ্রয় দান করেছিলেন। একবার নাজাশি বাদশার একটি প্রতিনিধি দল আঁ হযরত (সা.) -এর সমীপে উপস্থিত হলে তিনি (সা.) স্বয়ং অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উঠে দাঁড়ান। সাহাবাগণ বললেন, আমরা অভ্যর্থনা জানানোর জন্য যথেষ্ট, আমরা উঠে দাঁড়াচ্ছি। তিনি (সা.) বললেন, বাদশা আমাদের সঙ্গীদেরকে সম্মান জানিয়েছিলেন এবং তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করেছিলেন। এই কারণে সেই অনুগ্রহের প্রতিদান আমি স্বয়ং দিতে চাই। (সীরাতুল হুলবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭২)

এরপর আমরা মহানবী (সা.)-কে যখন একজন নীতি শিক্ষক হিসেবে দেখি, তখন এখানেও আমরা তাঁর আদর্শের বিচিত্র মর্যাদা লক্ষ্য করি। একবার হযরত আয়েশা (রা.) হযরত সুফিয়া (রা.)-এর অনতিদীর্ঘ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে হাসি-ঠাট্টার ছলে কোন কথা বলেছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন: আয়েশা! এটি এমন একটি কথা, যদি সমুদ্রে মিশিয়ে দেওয়া হয় তবে তাও কলুষিত হয়ে উঠবে। (সুনানুত তিরমিযী, কিতাব সাফাতুল কিয়ামাহ)

ছোটদের তরবীয়ত এবং উত্তম আচরণ শেখানোর জন্য মহানবী (সা.)-এর নমুনা কেমন ছিল? একজন সাহাবী আব্দুল্লাহ্ বিন আমির বর্ণনা করেন, একবার আঁ হযরত (সা.) আমাদের কাছে আসেন। আমি সেই সময় ছোট ছিলাম। আমি খেলার জন্য বাইরে যাচ্ছিলাম তখন আমার মা বললেন আব্দুল্লাহ্ এদিকে এস তোমাকে একটি জিনিস দিব। আঁ হযরত (সা.) তাকে বললেন, তুমি কি তাকে কিছু দিতে চাইছ? আমার মা বললেন, হ্যাঁ আমি তাকে খেজুর দিব। মহানবী (সা.) সত্যিই তোমার এমন অভিপ্রায় না থাকত এবং ছেলেকে কেবল কাছে ডাকার জন্য এমনটি বলতে তবে মিথ্যাবাদী হওয়ার গুনাহ করতে আর মিথ্যা আল্লাহ্ তা'লার নিকট অনেক বড় পাপ।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব)

অতএব সত্য প্রতিষ্ঠা করার এটিই মান যা মহানবী (সা.) তাঁর মান্যকারীদের কাছে প্রত্যাশা করেছেন। প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যাবহারের শিক্ষা রয়েছে, এ বিষয়ে তিনি (সা.) কিভাবে তরবীয়ত করেছেন? মহানবী (সা.)-কে একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে যে , হে রসুলুল্লাহ (সা.)! আমি কিভাবে বুঝতে পারব, আমি ভাল কাজ করছি না মন্দ কাজ করছি? মহানবী (সা.) বললেন, যখন তোমার প্রতিবেশীকে একথা বলতে শুনবে যে, তুমি খুব ভাল, তখন তুমি মনে করবে যে, তোমার আচার-আচরণ ভাল। আর যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীকে একথা বলতে শোন যে, তুমি খুব খারাপ তখন মনে কর যে, তোমার আচার-আচরণ মন্দ। তুমি অনুচিত কর্ম করছ।

(সুনাব ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ)

এই কয়েকটি বিষয় ছিল, আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শের কয়েকটি নমুনা ছিল যা আমি উপস্থাপন করেছি। তিনি (সা.) সমস্ত দিক থেকে পরম মার্গে উপনীত ছিলেন এবং তিনি (সা.) এই অবস্থা তাঁর মান্যকারীদের মধ্যেও দেখতে চেয়েছিলেন। খোদা করুক, আমরা যেন কেবল মৌখিক দাবি না করি, বরং আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শের উপর পরিচালিত হয়ে প্রকৃত আমলকারী হই, তাঁর প্রকৃত অনুসারী হই এবং নিজেদের ক্ষমালাভের উপকরণ সৃষ্টিকারী হই।

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব। তিনি (আ.) বলেন: সেই মানব যিনি তাঁর অস্তিত্বে, তাঁর গুণাবলীতে, তাঁর কাজে কর্মে, তাঁর নিরন্তর তৎপরতায় এবং আধ্যাত্মিক ও পবিত্র মানসিকক ক্ষমতাসমূহের মাধ্যমে জ্ঞানে, কর্মে, সাধুতায় ও দৃঢ়তায় সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপনক করেছেন এবং ইনসানে কামেল বা পরিপূর্ণ মানবরূপে অভিহিত হয়েছেন.....সেই ইনসান যিনি সর্বাপেক্ষা কামেল বা পরিপূর্ণ এবং প্রকৃত অর্থেই যিনি ইনসানে কামেল এবং কামেল নবী এবং যাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান ও পুনরুত্থন সংঘটিত হওয়ায় পৃথিবীতে প্রথম কেয়ামত প্রদর্শিত হয়েছে এবং মৃত জগৎ পুনরায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সেই কল্যাণমণ্ডিত নবী হচ্ছেন হযরত খাতামুল আম্বিয়া ইমামুল আসফিয়া খাতামুল মুরসালীন ফখরুন্নবীঈন জনাবে মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)। হে আমার খোদা! তুমি সেই প্রিয়তম নবীর উপরে সেই রহমত ও দরূদ বর্ষণ কর, যা তুমি পৃথিবীর আদিকারল থেকে অদ্যবধি অন্য কারো উপরেই বর্ষণ করনি। যদি এই আজিমুশশান, মহামহিমান্বিত নবী দুনিয়ার বুকে না আসতেন, তাহলে যে সকল ছোট ছোট নবী যেমন, ইউসুফ (আ.), আইয়ুব (আ.), মসীহ ইবনে মরিয়ম (আ.), মালাকি (আ.), ইয়াহইয়া (আ.) জাকারিয়া (আ.) ইত্যাদি, তাঁদের সত্যতার স্বপক্ষে আমাদের কাছে কোনও প্রমাণই থাকত না, যদিও তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন খোদা তা'লার প্রিয়পাত্র। এ তো সেই নবীরই (সা.) কৃপা ও অনুগ্রহ যার দরুন এঁরা সবাই পৃথিবীতে সত্য বলে স্বীকৃত হতে পেরেছেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

(ইতমামুল হুজ্জাত, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৮)

(অনুবাদ: মির্যা সফিউল আলাম, সহ-সম্পাদক বাংলা বদর)

মহানবী (সা.)-এর জীবনী

ন্যায়পরায়ণতা এবং ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে

মহম্মদ ইনাম গৌরী, নাযির আলা কাদিয়ান

অনুবাদ: মির্যা ইনামুল কবীর, মুয়াল্লিম সিলসিলা

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

অর্থাৎ হে যাহারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। আর কোন জাতির শত্রুতা তোমাদের যেন কখনো অবিচার করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা সদা ন্যায় বিচার কর। এ (কাজটি) তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটে।

আদ্‌ল এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে উভয় পক্ষের সঙ্গে সম-ব্যবহার করা। বেশি বাড়া-বাড়ি না করা। উভয়ের মধ্যবর্তী পন্থাকে অবলম্বন করাকে এ'তেদাল বা ইনসাফ বলা হয়ে থাকে।

ন্যায়পরায়ণতা ও সু-বিচারের জন্য কোরআন করীমে অন্য শব্দ 'কিস্ত্' ব্যবহার হয়েছে। যেমন সূরা মায়েদার ৭নম্বর আয়াত যা এখন তেলাওয়াত করা হয়েছে। এর মধ্যেও 'আদ্‌ল' এবং 'কিস্ত্' উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। এ-দুটিই সমার্থক শব্দ। কিন্তু সামান্য পার্থক্য এই যে, দু'জন ব্যক্তির মধ্যে সম-ব্যবহারকে 'আদল' বলা হয়ে থাকে আর কিস্তের সঙ্গে অন্যের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড় করানোর অর্থ হয়ে থাকে। অর্থাৎ কিস্তের মানে হচ্ছে কারোর অধিকার সম্পূর্ণ রূপে প্রদান করা। তাতে যেন কম-বেশি না হয়।

আঁ হজরত (সাঃ) এর আগমন কালে আরব দেশের যা অবস্থা ছিল তাতে ন্যায় ও সু-বিচারের লেশমাত্র ছিল না। **গরমযঃ রং ৎরমযঃ** জোর যার মুলুক তার' আইন চলত। প্রাচীন প্রথা ও রীতি-নীতির উপর নির্ভরশীল সমাজ ছিল। বিভিন্ন গোষ্ঠির মাঝে লড়াই-ঝগড়া সাধারণ ব্যাপার ছিল। সমর্থনকারীদের প্রতি ডাক দেওয়াই যথেষ্ট ছিল। অতঃপর গোষ্ঠীগুলির মাঝে হত্যার প্রতিশোধের ধারা অব্যাহত থাকত। সুতরাং 'বসুস এর যুদ্ধ' যা এক সহযোগী গোষ্ঠীর উট কে মারার প্রতিশোধের নামে আরম্ভ হয়েছিল। তার কারণে চল্লিশ বছর ধরে হত্যার ধারা চলতে থাকে। পুরুষ ও নারীদের বন্দি বানিয়ে তাদেরকে কৃতদাস বানানো অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল। নারীদের তো মর্যাদাই ছিল না। না কন্যা রূপে এবং না স্ত্রী রূপে আর না মাতা রূপে। ঠিক এরকম একটা সময়ে দয়ার সাগর রহমাতুল্লিল আলামিন হজরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) খোদার পক্ষ হতে প্রেরিত হলেন এবং কোরআন করীম অবতীর্ণ হওয়া আরম্ভ হল। ধাপে ধাপে পশুদেরকে মানুষ বানানোর এবং মানুষদেরকে চরিত্রবান মানুষ বানানোর আর চরিত্রবান মানুষদেরকে খোদাভীরু মানুষে বরং খোদারূপী মানুষে রুপান্তরিত করার মো'জেযা প্রকাশ পেল।

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহে মাওউদ ও মাহদী-এ- মাওহুদ (আঃ) এই মো'জেযার উল্লেখ করে নিজ পংক্তির মধ্যে বলেন যে :

کہتے ہیں یورپ کے ناداں یہ نبی کامل نہیں
وحشیوں میں دیں کو پھیلانا یہ کیا مشکل تھا کار
پر بنانا آدمی، وحشی کو ہے اک معجزہ
معنیٔ راز نبوت ہے اسی سے آشکار

ইউরোপের অজ্ঞরা বলে এই নবী পূর্ণ নয়

পশুদের মধ্যে ধর্মকে প্রচার করা এটা কি কোন মুশকিল কাজ ছিল

কিন্তু পশুকে মানুষ বানানো একটা মো'জেযা ছিল।

নবুওতের মানের ভেদ এতেই প্রকাশ পায়।

একই ভাবে তিনি তাঁর আরবী কবিতায় বলেন :

صَادَفْتَهُمْ قَوْمًا كَرُوْثٍ ذِلَّةً
فَجَعَلْتَهُمْ كَصَبِيْكَةِ الْعِقْيَانِ

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সাঃ) আপনি ঐ আরব জাতিকে গোবরের ন্যায় নিকৃষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু নিজ পবিত্রকরণ শক্তির দ্বারা ও তরবিয়তের প্রভাবে তাদের স্বচ্ছ সোনায় রুপান্তরিত করেছেন।

শ্রোতামণ্ডলী! আঁ হজরত (সাঃ) এর ন্যায়পরায়ণতা ও সু-বিচারের বিবরণ বর্ণনা করা এ জন্য কষ্টসাধ্য বিষয় যে, সর্বদা প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর পদক্ষেপ ন্যায়ের ধাপকে অতিক্রম করে এহ্‌সান বা দয়ার মঞ্জিলে গিয়ে পৌঁছায়। সুতরাং বলা হয় যে, কখনও এমন হয়নি যে আঁ হজরত (সাঃ) কারোর নিকট হতে ঋণ নিয়েছেন, আর তাকে ফেরতের সময় তার থেকে বেশি ফেরত দেন নি।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর আমি ন্যায়পরায়ণতা ও সু-বিচারের ব্যাপারে সর্বপ্রথম আঁ হজহরত (সাঃ) এর পারিবারিক জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় বর্ণনা করব। কেননা যে ব্যক্তি নিজ গৃহে ন্যায় ও সু-বিচারকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে না, সে বাইরে কিরূপে এই গুণের উত্তম দৃষ্টান্ত হতে পারে।

আমাদের প্রভু হজরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এর মর্যাদা দেখুন, সকাল-সন্ধ্যা ঐশী বাণী অবতীর্ণ হচ্ছে, খাতামান্নাবীঈনের পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হচ্ছেন, قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى 'ক্বাবা ক্বাওসাইনি আও আদনা' এর সু-সংবাদ আসছে, তাঁর হাতকে খোদাতা'লা নিজের হাত বলে অভিহিত করেছেন, সমস্ত মানব মণ্ডলীকে বার্তা দেওয়া হচ্ছে যে, যদি আল্লাহর ভালোবাসা চাও, তাহলে এই রসূলের অনুসরণ ও প্রেম আবশ্যিক। অন্য দিকে তাঁর এই অবস্থা ছিল যে, اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ নিঃসন্দেহে আমি খোদাতা'লার নবী এবং তাঁর নৈকট্য প্রাপ্ত এতে কোন মিথ্যা ও অতিরঞ্জনতা নেই। কিন্তু একই সঙ্গে বলছেন কিন্তু اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ আমি একজন বান্দা এবং আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র।

একই ভাবে অন্য কোন এক সময় বলেন :

وَاللّٰهِ مَا اَدْرِىْ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا يُفْعَلُ بِىْ

যদিও আমি আল্লাহর রসূল কিন্তু খোদার কসম আমি জানি না যে, আমার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা হবে। হজরত আবু-হুরাইয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি একবার রসূলে করীম (সাঃ)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, কাউকে তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাবে না। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞাসা করল যে, হে আল্লাহর রসূল! আপনিও কি নিজ আমলের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবেন না। তিনি (সাঃ) বলেন :

وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِىَ اللّٰهُ بِفَضْلِهٖ وَرَحْمَتِهٖ

হ্যাঁ আমিও আমার আমলের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব না। আল্লাহর ফযল ও তার রহমত আমাকে আবৃত্ত করে নেওয়া ছাড়া।

যখন তাঁর পারিবারিক জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন সর্বপ্রথম এক অসাধারণ ধনী, অভিজ্ঞ, চল্লিশ বছরের পূর্ণ বয়স্কা নারী হজরত খাদিজার উল্লেখ সামনে চলে আসে। যিনি একজন পঁচিশ বছরের যুবকের সততা, খোদাভীরুতা, সাধুতা ও বিশ্বস্ততার শুধুমাত্র চর্চা শুনেই নয় বরং নিজ ব্যবসার মালের সঙ্গে প্রেরণ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর আঁ হজরত (সাঃ) এর নিকট বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করেন। আর যখন বিবাহ হয়ে গেল, তখন তাঁর সুসামঞ্জস্য ও ইনসাফে পূর্ণ জীবন এবং তাঁর উদার চরিত্রের কল্যাণে বিসর্জিত হয়ে আল্লাহতা'লার প্রথম ওহীর অবতরণ মাত্রই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ঈমান আনয়ন করেন। আর তাঁর প্রত্যাদিষ্টের বার্তা প্রাপ্তির পর সৃষ্ট আতঙ্ককে দূর করতঃ তাঁকে প্রোৎসাহিত করেন যে, আমার মাথার মুকুট! আপনি কিজন্য আতঙ্কিত হচ্ছেন, আপনি কখনও অসফল হবেন না, বরং খোদার শপথ করে সাক্ষী প্রদান করেন যে,

"আল্লাহতা'লা আপনাকে কখনও অসফল করবেন না, কেননা আপনি তো আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি খেয়াল রাখেন এবং দুর্বলদের বোঝা ওঠান এবং সে সমস্ত সচরিত্র যা পৃথিবী থেকে উঠে গিয়েছিল সে সমস্ত আপনার জীবনে পাওয়া যায়। আর অতিথি আপ্যায়ণের গুণে অনন্য। এবং মানুষের প্রকৃত কষ্টের সময় আপনি তাদের সাহায্য করেন।"

আঁ হজরত (সাঃ) হজরত খাদিজা (রাঃ) এর বিনয় ও আত্ম-বিসর্জনতা-কে তাঁর জীবন ও সর্বদা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। আর তাঁর মৃত্যুর পরেও সর্বদা প্রেম ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে স্মরণ রেখেছেন। ঘরে কোন পশু জবাই হলে তার মাংস হজরত খাদিজা (রাঃ)-র বান্ধবীদের নিকট পাঠানোর তাগিদ দিতেন।

আরও একজন পবিত্রা স্ত্রীর কথা উল্লেখ করছি। সফিয়া বিনতে হাই একজন ইহুদী গোষ্ঠী বনু নাজির ও

বনু কোরাইজার শাহ্‌যাদী ছিলেন। খায়বারের যুদ্ধে তাঁর পিতা, ভাই ও স্বামী আরও কিছু আত্মীয় মারা গেছিল। এ-রকম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় সফিয়া বন্দিনী হয়ে আসলেন। সাহাবাগণ আঁ হজরত (সাঃ) এর নিকট নিবেদন করলেন যে, এই শাহ্‌যাদী আপনি ছাড়া আর কারও জন্য উপযোগী হবে না। আঁ হজরত (সাঃ) তাঁর প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করলেন এবং বললেন তুমি নিজের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাইলে তেহামার অধিকার আছে। হ্যাঁ যদি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অবলম্বন করতে চাও তাহলে নিঃসন্দেহে তোমার ভালো হবে। সফিয়া বললেন আমি আপনাকে সত্য মনে করি। তিনি (সাঃ) বললেন নিঃসন্দেহে আমি সত্য, কিন্তু ফয়সালার অধিকার তোমার আছে। সফিয়া আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ) এবং ইসলাম-কে অবলম্বন করলেন। অতঃপর আঁ হজরত (সাঃ) তাকে স্বাধীন করেদিলেন। একই সঙ্গে তিনি সফিয়াকে এ অধিকারও দিলেন যে, যদি তুমি চাও তাহলে নিজ গৃহবাসীর নিকট ফিরে যাও অথবা চাইলে তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও। হজরত সফিয়া (রাঃ) আঁ হজরত (সাঃ) এর সহিত আবদ্ধ হতে পছন্দ করলেন। আর এ-ভাবে তাঁর ইচ্ছায় তাঁর সঙ্গে বিবাহ করলেন ও তাঁর স্বাধীন হওয়াকে তাঁর জন্য দেনমোহর নির্ধারণ করলেন।

হজরত সফিয়া (রাঃ) বলেন আমাকে যখন বন্দিনী রূপে আঁ হজরত (সাঃ) এর দরবারে উপস্থিত করা হল, তখন তাঁর চেয়ে বেশি অপছন্দনীয় মানুষ আমার দৃষ্টিতে অন্য কেউ ছিল না। কিন্তু যখন আঁ হজরত (সাঃ) তাঁকে বললেন যে, তোমার গোষ্ঠী মুসলমানদের সঙ্গে এরূপ এরূপ আচরণ করেছে। তোমার বাপ সমগ্র আরবকে আমার বিরুদ্ধে টেনে এনেছে, আর আমাদের উপর আক্রমণ করেছে। যার কারণে অসহায় হয়ে তোমার জাতির সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। এই সত্য শোনার পর ও আঁ হজরত (সাঃ) এর ন্যায় ও সু-বিচার এবং তাঁর সঙ্গে কৃত দয়া ও স্নেহের এমন প্রভাব পড়ল যে, তিনি বলেন "যখন আমি তাঁর নিকট হতে উঠি তখন আমার দৃষ্টিতে তাঁর থেকে বেশি প্রিয় ও পছন্দনীয় ব্যক্তিত্ব আর কেউ ছিল না।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

শ্রোতা মণ্ডলী! মদীনায় থাকা কালে আঁ হজরত (সাঃ) এর বয়স পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত করেছিল। কিন্তু শুধুমাত্র শিক্ষা-দীক্ষা ও জাতির প্রয়োজনকে দৃষ্টিপটে রেখে তাঁকে একাধিক বিবাহ করতে হয়েছিল। আর একত্রে নয়জন স্ত্রী তাঁর তরবিয়ত ও লালন পালনে ছিল। কিন্তু তিনি কখনও তাদের দায়িত্বের কারণে আতঙ্কিত বা ঘাবড়ে যান নি, বরং চরম সু-ব্যবস্থা ও মহান মিতাচারি ওবং ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের সঙ্গে সবার অধিকার প্রদান করেছেন ও সবার প্রতি সমভাবে লক্ষ রেখেছেন। তিনি আসরের নামাজের পর কখনও সমস্ত স্ত্রীগণকে সেই স্ত্রীর ঘরে ডেকে নিতেন যেখানে তার পালা হত আবার কখনও সমস্ত স্ত্রীদের গৃহে উপস্থিত হয়ে তাঁদের অবস্থা জিজ্ঞাসাবাদ করতেন।

ঐ সমস্ত পবিত্র স্ত্রীদের মাঝে চরম সততার সামঞ্জস্য ও ইনসাফপূর্ণ বিভাজন সত্ত্বেও তিনি এই দোয়া করতে থাকতেন যে, "হে আল্লাহ! তুমি জান এবং দেখ যে, মানুষের দ্বারা যতদূর পর্যন্ত সমভাবে ইনসাফের বিভাজন হতে পারত, সেটা তো আমি করে থাকি, কিন্তু হে আমার প্রভু! অন্তরের উপরে তো আমার কিছু করার নেই। যদি অন্তরের অভিপসা কোন গুণ ও যোগ্য নৈপুণ্যের কারণে হয়ে থাকে তাহলে তুমি আমার ক্ষমা কর।

যেভাবে প্রারম্ভে আরববাসীদের অজ্ঞতা এবং প্রচলিত কু-প্রথার উল্লেখ করা হয়েছে এদেরই মধ্যে থেকে কিছু বুদ্ধিমান ও সুশীল মানুষদের চিন্তা হল যে, এটা তো একটা বড় অন্যায় হচ্ছে যে, শক্তিধরগণ দুর্বলদেরকে গ্রাস করেই চলেছে। এবং প্রায় দিনের গৃহ যুদ্ধ ও ছিন্তাই, মারামারির ফলে শত শত গৃহ ধ্বংস হয়েছে এবং হাজার হাজার শিশু এতিম হয়েছে আর এভাবে তো সমগ্র দেশ একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং এস আমরা এমন কোন উপায় অবলম্বন করি যে, তার ফলে এই অত্যাচার ও বর্বরতা হতে মুক্তি পাওয়া যায়। অতঃপর জনাকয়েক নেতা যাদের নাম ফযল বিন হারিস, ফযল বিন ওরায়া এবং ফযল বিন ফতালা ইত্যাদিরা ছিল। যারা আবার সর্বসম্মত ভাবে একটা চুক্তি করল যার মধ্যে এই অঙ্গীকার ও শপথ করা হল যে, যারা অত্যাচারিত তাদের সাহায্য করা হোক, আর যাদের অধিকার হরণ করা হয়েছে, তাদের অধিকার প্রদান করা হোক। যেহেতু এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ ব্যক্তিদের বেশির ভাগের নামে সঙ্গে ফযল যুক্ত ছিল একারণে এই সঙ্গঠনের নাম হিলফুলফযুল রাখা হল। কিন্তু এই চুক্তিও পানির বুদবুদ প্রমাণিত হল, কারণ এই চুক্তির উপর আমল দেওয়া কারোরই ক্ষমতা হল না। এমন কি হাব্বে ফিরারের মত গৃহযুদ্ধে বহু মানুষ মারা গেল। অতঃপর কোরাইশের কিছু মান্যগণ্য ব্যক্তিরা চাইল হিফুল ফুযুল কে পুনরায় জীবিত করা যাক। সুতরাং কোরাইশদের নেতাদের একটা বৈঠক হল, যাতে বনু হাসিম, বনু আসাদ, বনু যাহেরা ও বনু তামিম ইত্যাদিরা অংশ গ্রহণ করল। সেই নেতাদের সঙ্গে আমাদের প্রভু হজরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এর সত্ত্বাও স্বয়ং উপস্থিত ছিল। যিনি তাঁর যৌবনের সূচনা কালে ছিলেন। কিন্তু ঐ চুক্তি নবীনিকরণ সত্ত্বেও কোন দলকে নিজেদের অজ্ঞতার পরম্পরা থেকে সরে এসে না তো অত্যাচারিতের সাহায্য করার কোন সৌভাগ্য হয়েছে আর না কোন বঞ্চিতকে তার অধিকার দানের কোন চেষ্টা করা হয়েছে। হ্যাঁ যদি কারোরই এই অঙ্গীকারের উপর আমল করার সৌভাগ্য হয়েছে তাহলে তিনি হলেন আমাদের প্রিয় প্রভু হজরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) ।

সুতরাং নবুওতের দাবীর পরের একটা ঘটনা আছে যে, একজন গ্রাম্য ব্যক্তি খানা-কাবার নিকট আসল, যেখানে কেরায়েশদের সর্দারগণ একত্রিত হয়েছিলেন এবং বিলাপ করল যে, আবুজেহেল আমার কিছু টাকা মেরে দিয়েছে, আর সে আদায় করছে না। আপনারা আমার সাহায্য করুন। তারা বদমায়িসি করে আঁ হজরত (সাঃ) এর ঘরের ঠিকানা দিল যে, তার নিকট যাও তিনি তোমার সাহায্য করতে পারবেন। তাদের ধারণা ছিল যে, আঁ হজরত (সাঃ) সাহায্যের জন্য বের হবেন আর আবুজেহেল নাঊযুবিল্লাহ্ তাঁকে লাঞ্ছিত করে বের করে দেবে। আর সে বের হবে না। তখন আমরা জিজ্ঞেস করব যে, হিলফুল ফুযুলের অঙ্গীকারের নবীনীকরণে তো আপনিও শামিল ছিলেন। তাহলে কেন সাহয্যের জন্য বের হলেন না?

মোট কথা সে ব্যক্তির সাহায্যের জন্য আঁ হজরত (সাঃ) এর নিকট উপস্তিত হয়ে নিজের অবস্থা বর্ণনা করল। আঁ হজরত (সাঃ) সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে চলে গেলেন ও আবুজেহেলের ঘরে পৌঁছলেন। আবুজেহেল ঘর থেকে বের হতেই বললেন তুমি তার ঋণ কেন আদায় করছ না? সে ঘরে ফিরে গেল আর টাকা এনে তাকে দিয়ে দিল। আর সেই গ্রাম্য ব্যক্তি আঁ হজরত (সাঃ) এর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে ফিরে চলে গেল।

যখন কোরয়েশদের সর্দারগণ জানতে পারল, তখন আবুজেহেলকে গঞ্জনা দিল যে, আমাদেরকে আঁ হজরতের বিরুদ্ধে উস্কানি দাও, কিন্তু যখন আমরা তাকে তোমার ঘরে পাঠালাম তো তুমি তাঁর প্রতাপে প্রভাবিত হয়ে টাকা আদায় করে দিলে। আবুজেহেল উত্তর দিল যে, কি বলব যে, কি ঘটনা ঘটেছিল। যখন সে আমার দরজায় আসল , তখন দেখি যে, আঁ হজরতের ডান ও বাম পাশে দুটি ভয়ঙ্কর উট দাঁড়িয়ে আছে। আর অমি যদি একটু এদিক ওদিক করি তাহলে মনে হচ্ছিল যে, সেগুলো আমাকে চিরে ফেলে দেবে। এজন্য তাঁর আদেশের প্রতি আমল দেওয়া ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। সুতরাং এই ছিল অত্যাচারিদের সাহায্যকারী ও ন্যায়বিচার ও ইনসাফের প্রতিমূর্তি হজরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এর বাস্তব আদর্শ আর এর মধ্যে আল্লাহতা'লার সমর্থন ও সাহায্যের মহান নিদর্শন।

শ্রোতামণ্ডলী! মানুষ কারোর দুঃখ দেখলে প্রকৃতিগত ভাবে দয়া প্রদর্শনের জন্য আকৃষ্ট হয়ে যায়। কোন দোষী ব্যক্তিকেও শাস্তি পেতে দেখে চিন্তি হয়ে যায়। আর চেষ্টা করা হয় যে, তাকে যেকোন উপায়ে শাস্তি হতে মুক্তি কিরূপে দেওয়া যায়। রহমাতুল্লিল আলামিন (সাঃ) সম্বন্ধে খোদাতা'লার রউফ ও রহীম হওয়ার কোরআন করীমে সাক্ষী দিয়েছে, কিন্তু যে জাতির চরিত্র নিম্নমুখী হতে লাগে এবং বিভিন্ন ধরণের নোংরামীতে ডুবে যায় তখন তাদের মধ্যে এই রীতি অতি সাধারণ হয়ে যায় যে, বড় লোকেরা তো আইন ভঙ্গ করে ও বেঁচে যায়, আর শুধু গরীব আর অসহায় লোকেরাই শাস্তি ভোগ করে। কিন্তু হজরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) রহমাতুল্লিল আলামিন এবং রউফ ও রহীম হওয়া সত্ত্বেও শরীয়তের আদেশাবলীকে বলবৎ করার ব্যাপারে চরম উৎসাহ রাখতেন। এবং সুকিচার ও ইনসাফকে কখনও হাত থেকে যেতে দিতেন না। সুতরাং বুখারী শরীফে হজরত আয়েশা (রাঃ) এর এই উদ্ধৃতি রয়েছে যে,

"বনু মখযুম গোত্রের ফাতেমা নামের একজন মহিলা চুরি করে। অতঃপর লোকেরা চাইল যে, রসূলে করীম (সাঃ) এর নিকটে গিয়ে সেই মহিলার সম্পর্কে সরলতা অবলম্বনের সুপারিশ করা হোক। সুতরাং উসামা বিন জায়েদ (রাঃ) যে রসূলে করীম (সাঃ) এর অতি পরিচিত ছিল তাঁকে প্রস্তুত করল এবং তিনি রসূলে করীম (সাঃ) এর নিকট এই কথার উল্লেখ করলেন। হজরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এই বিষয়টিতে খুব দুঃখ পেলেন এবং ক্রোধে তাঁর চেহারা মোবারক লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন :

"বনী ইসরাঈলের অভ্যাস ছিল যে, যখন কোন ধনী ব্যক্তি চুরি করত

তখন তাকে ছেড়ে দিত কিন্তু যখন কোন গরীব চুরি করত তখন তার হাত কেটে দিত। কিন্তু আমার এই অবস্থা যে, সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ যদি আমার মেয়ে ফতেমাও চুরি করত তাহলে আমি তার ও হাত কেটে দিতাম।"

বদরের যুদ্ধে মক্কার মোশরেকদের বন্দীদের মাঝে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চাচা হজরত আব্বাস (রাঃ) ও ছিলেন। বন্দীদের পর্যবেক্ভষণের দায়িত্ব যখন হজরত উমর (রাঃ)-কে দেওয়া হল তখন তিনি হজরত আব্বাস সহ সমস্ত বন্দীদের বন্ধন আরও শক্ত করে দিলেন যা মসজিদ নববীর চৌহদ্দির মধ্যে ছিল। যার ফলে হজরত আব্বাস (রাঃ) কষ্টে আওয়াজ বের করতে লাগলেন। যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজ চাচার ব্যাথার আওয়াজ শুনতে পেলেন তখন তিনি অশান্ত হয়ে পড়লেন ও তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। আনসাররা কোনভাবে একথা বুঝতে পারল আর তারা হজরত আব্বাসের বাঁধন ঢিলা করে দিল। এভাবে তার অওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। ক্ষণিকের মধ্যেই তিনি (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন আব্বাসের ব্যাথার আওয়াজ কেন আসছে না। সাহাবাগণ বললেন হে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপনার কষ্টের ধারণা করে তার দড়ি ডিলা করে দিয়েছি। তিনি (সাঃ) বললেন এটা ইনসাফের বিরুদ্ধে, হয় তোমরা সমস্ত বন্দীদের বাঁধন ঢিলা করে দাও অথবা আব্বাসের বাঁধনও শক্ত করে দাও। অতঃপর সাহাবাগণ সমস্ত বন্ধীদের বাঁধন ঢিলা করে দিলেন।

হুনাইনের যুদ্ধে চব্বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজার ছাগল, চার হাজার চাঁদির আওরিয়া (এক আওকিয়া এক তুলা সাত মাসা পরিমান) এবং ছয় হাজার বন্দী মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল। হজরত নবী করীম (সাঃ) বললেন:

"আমি নিজের এবং বনু আব্দুল মুত্তালিবের বন্দীদেরকে কোনও মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দিচ্ছি। আনসার মোজাহিদ গণ বললেন, আমরাও নিজ নিজ বন্দীদের কোন মুক্তিপণ ছাড়াই স্বাধীন করছি। এখন শুধু বনী শুলাইমা ও বনু ফাজারাহ্ থেকে গেল। এদের নিকট এটা আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল যে, আক্রমণকারী শত্রুর প্রতি (যারা সৌভাগ্যবান যে ধৃত হয়েছে) এরূপ দয়ার আচরণ করা যাক। তারা নিজ ভাগের বন্ধীদেরকে স্বাধীন বরল না। সুতরাং (সাঃ) তাদের ডাকলেন, এবং প্রত্যেক বন্দীর মূল্য ছয় উট নির্ধারণ করলেন। আর এই মূল্য রসূলে করীম (সাঃ) স্বয়ং আদায় করলেন। আর এভাবে বাকী বন্দীদের ও মুক্ত করে দিলেন।

এই ঘটনা যেখানে তাঁর দয়ালু চরিত্রে সাক্ষী প্রদান করে, সেখানে এই সত্যতাকেও প্রকাশ করে যে, তাঁর ইনসাফপ্রিয় প্রকৃতি এটা কখন পছন্দ করত না যে, কিছু বন্দী তো আত্মীয়তার কারণে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে আর বাকীদেরকে রীতি অনুসারে বন্দী রাখা হোক। সুতরাং তিনি (সাঃ) অবশিষ্ট দুর্বল বন্দীদের মূল্য আদায় করে তাদের মুক্ত করে দিলেন।

আঁ হজরত (সাঃ) এর প্রতিষ্ঠিত আদালতি ব্যবস্থাপনাতে রাজ্যের মুখ্য শাসন কর্তা ও একজন সাধারণ শহরবাসী আইনের দৃষ্টিতে সমান। সুতরাং একটা মোকাদ্দমাতে হুজুর (সাঃ) স্বয়ং একটা বেদুইনের বিরুদ্ধে বন্দী পক্ষ ছিলেন, নিজের দাবীর সসম্পর্কে হুজুর (সাঃ)কে সাক্ষী পেশকরার জন্য বলা হল। তাতে হজরত খুজাইমা বিন সাবিত (রাঃ) হুজুর (সাঃ) এর পক্ষ হতে সাক্ষ্য প্রদান করল। এ ঘটনার বিবরণ সুনান আবি দাউদে এভাবে উল্লেখ আছে যে, রসূলে পাক (সাঃ) এক বেদুইনের নিকট হতে ঘোড়া ক্রয় করেন আর তার দাম নেওয়ার জন্য নিজের পিছন পিছন আসতে বলে। তিনি (সাঃ) খুব দ্রুত হাঁটছিলেন। বেদুঈন তার ধীর গতির কারণে পিছে থেকে গেছিল। তার সঙ্গে (পথে) লোকেদের দেখা হয় এবং তারা সেই ঘোড়ার দাম আরো বেশি লাগাল। তারা জানত না যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই ঘোড়া কিনে ফেলেছেন। বেদুঈন রসূলে পাক (সাঃ)কে ডাকল এবং জিজ্ঞাসা করল যে, আপনি এই ঘোড়া ক্রয় করবেন? নাকি আমি এটাকে অন্য কারোর নিকট বিক্রয় করে দেব। তিনি (সাঃ) থেমে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি কি তোমার নিকট হতে এই ঘোড়া কিনে নিইনি? বেদুঈন উত্তর দিল না। খোদার শপথ আমি এই ঘোড়া আপনার নিকট বিক্রী করিনি। বড় আশ্চর্য তিনি (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন কর নি মানে, আমি তোমার নিকট হতে এই ঘোড়া কিনে নিয়েছি। তখন বেদুঈন বলল কোন সাক্ষী পেশ কর। হোজাইমা বিন সাবিত বলল "আমি সাক্ষী দিচ্ছি তিনি (সাঃ) এই ঘোড়া তার কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন। তিনি (সাঃ) খোজাইমার নিকট গেলেন এবং বললেন "তুমি কিসের ভিত্তিতে এই সাক্ষী দিচ্ছ, তিনি উত্তরে বললেন, আপনার সত্যায়নে হে আল্লাহর রসূল।

সুতরাং কতই না সততা ও বিশ্বস্ততা ছিল এই সাক্ষীর এবং কতই না কথায় সত্য ইনসাফকারী ছিলেন তিনি, যার সম্পর্কে সাক্ষী দেওয়া হচ্ছে।

اللهم صل على محمد و على آل محمد و بارك وسلم

হজরত রসূলে করীম (সাঃ) নিজ সাহাবাদের মধ্যে চরম মানের ন্যায় বিচার করতেন। কিন্তু একই সঙ্গে এই সতর্কতা দিতেন যে, দেখ আমিও তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ, তোমরা আমার নিকট তোমাদের বিবাদ নিয়ে আসো। হতে পারে যে তোমাদের মধ্যে কেউ নিজের বিপক্ষের উপর যুক্তি অধিক বাক পটুতার সঙ্গে পেশ করে, আর আমি তার পক্ষে ফয়সালা দিয়ে দিই, তাহলে সে স্মরণ রাখুক যে, যে বস্তু সে অন্যায় ভাবে গ্রহণ করবে, সে তো একটা আগুনের টুকরো নিয়ে যাবে। ইচ্ছা করলে নিয়ে নিক, আর ইচ্ছা করলে ছেড়ে দিক । (বুখারী শরীফ)"

আঁ হজরত (সাঃ) বলেন :

"কাজী বা বিচারক তিন প্রকারের হয় এক হল জান্নাতী আর দ্বিতীয় হল দোযখী, জান্নাতী হল তারা যারা সত্যকে জেনে সে অনুসারে সু-বিচার করে। আর যে কাজী সত্যকে চিনেও অন্যায় বিচার করে সে দোযখী। অনুরূপভাবে সেই বিচারক যে মানুষের বিচার বিনা কোন চিন্তা ভাবনাতেই করে, সেও দোযখী (আবু দাউদ) ।"

হজরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আঁ হজরত (সাঃ) বলেছেন :

"যাকে মানুষের মধ্যে বিচারক বানানো হয়েছে, সে তো ছুরি ছাড়াই জবাই হয়ে গেছে (তিরমিযী ও আবু দাউদ)"।

হজরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,

হজরত রসূল আকরাম (সাঃ) বলেছেন যে, "যে বিচারক পদ চেয়ে গ্রহণ করবে সে নিজের আত্মার জালে ফেঁসে যাবে। এবং যাকে বাধ্যতা মূলক ভাবে এই পদ দেওয়া হবে, তার প্রতি এক ফেরেশতা অবতীর্ণ হবে, যে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে ।

(তিরমিযী ও আবু দাউদ)"।

যে সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে হজরত রসূলে করীম (সাঃ) এর অধিকার হত, তিনি সেখানেও ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফকে দৃষ্টিপটে রাখতেন। কিন্তু কোন কোন কারণ বশতঃ কোন অধিকারীর অধিকার ক্ষুন্ন না করেও অন্যকে বেশি দান করতেন। সুতরাং হোনাইনের যুদ্ধ হতে ফেরার পর আরবের কোন কোন সর্দার বা নেতাকে অন্যের উপর প্রাধান্য দিয়ে মনের শান্তনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত করেন। আর এই খাতির ও স্নেহের ফলাফল এই হল যে, আরবের সেই সমস্ত সর্দারগণ শুধুমাত্র মুসলমানই হন নি বরং তাদের গোষ্ঠিও মুসলমান হয়ে গেল। সুতরায় আঁ হজরত (সাঃ) বললেন অনেক মানুষকে আমি মনের শান্তনার উদ্দেশ্যে দিয়ে থাকি, যেখানে তারা ছাড়া অন্যেরা আমার প্রিয় হয়ে থাকে। কিন্তু তাদেরকে আমি ইসলামের নিকটবর্তী করার জন্য এরূপ করি (বুখারী শরীফ)"।

কিন্তু এক নির্বোধ অপবাদ আরোপ করল যে, এই বন্টনে ন্যায় বিচার করা হয় নি। আঁ হজরত (সাঃ) যখন এ খবর প্রাপ্ত হলেন তখন শুধুমাত্র এটুকু বললেন যে,

"যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল সু-বিচার না করে তাহলে আর কে করবে? আল্লাহতা'লা মুসার প্রতি দয়া করুন, তাঁর প্রতি এর থেকেও গম্ভীর অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল (বুখারী)।"

একই ভাবে অন্য এক সময় গণিমতের বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সময় একজন আনসারী অপবাদ অরোপ করল যে, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ) এটা কিরূপ ব্যাপার যে, রক্ত তো আমাদের তরবারী হতে পড়েছে কিন্তু সম্পদ আপনি মহাজির মধ্যে বন্টন করছেন। আঁ হজরত (সাঃ) কতই না উত্তম দিলেন, "তোমার কি এটা পছন্দ নয় যে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ তো মহাজিররা নিয়ে যাক আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে ঘরে নিয়ে যাও?

এই উত্তর শুনে যেখানে সেই অপবাদ আরোপকারী নিজে লজ্জিত হল সেখানে সমস্ত আনসারের দল তার অপবাদের প্রতি তিরষ্কার করে।

প্রকৃতপক্ষে রসূলে করীম (সাঃ) যেখানে সম্পদের বন্টনের ব্যাপারে বিশেষ কোন কারণকে দৃষ্টিপটে রেখে অগ্রগণ্যতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সেটাও ন্যায় বিচার ও ইনসাফ বহির্ভুত ছিল না। বরং ঐ সম্পদের পঞ্চমাংশ যার বন্টনে রসূলে করীম (সাঃ) পূর্ণ অধিকার রাখতেন কিন্তু তাতেও নিজ সত্ত্বাও কলেজার টুকরোদের সর্বদা বঞ্চিত রাখতেন। তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যা হজরত ফাতেমা (রাঃ) যখন দেখলেন যে, অনেক বন্দী আসছে এবং আঁ হজরত (সাঃ) তাদের অভাবীদের মাঝে বন্টন করে দিচ্ছেন তখন তিনিও ঘরের প্রয়োজনের স্বার্থে একজন সেবকের আগ্রহ করলেন যে, জাঁতা পিষে আমার হাত ক্ষত হয়ে গেছে। কিন্তু রসূল করীম (সাঃ) বললেন : " খোদার শপথ! যে, আমি তোমাকে সেবা প্রদান করে দরিদ্র লোকদের বঞ্চিত রাখতে পারি না। ক্ষুধায় যাদের দূরাবস্থা এবং যাদের খাবার দাবার জোটে না আমি বন্দীদের বিক্রয় করে সেই দরিদ্রদের প্রতি খরচ

করব।"

এবং নিজ কন্যার কষ্ট দূরীভূত করার জন্য ব্যবস্থাপত্র দিলেন যে, ফরজ নামাজের পর সুবহানাল্লাহ্,আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহুআকবর পাঠ কর। এটা কয়েদি ও খাদিমের উপঢৌকন হতে উত্তম।

শ্রোতামণ্ডলী! প্রারম্ভে আমি সূরা মায়েদার নয় নম্বর আয়াতের যে তেলাওয়াত করেছিলাম সেখানে শত্রুদের সঙ্গেও ন্যায় বিচার ও ইনসাফ করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কয়েকটি ঘটনা উত্থাপন করছি।

একবার কিছু সাহাবীকে বাইরের খবরাখবর দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল। কেননা যুদ্ধাবস্থা চলছিল, সেহেতু অবস্থার উপর দৃষ্টি রাখতে হত। সেই সময় শত্রুদের কিছু লোক পবিত্র স্থানের গন্ডির মধ্যে পাওয়া গেল। মুসলমানগণ ধারণা করল যে, যদি আমরা এদেরকে জীবিত ছেড়ে দিই তাহলে এরা গিয়ে মক্কাবাসীদেরকে খবর পৌঁছে দেবে। আর আমরা মারা যাব। এই ধারণা বশতঃ তাদের উপর আক্রমণ করে দিল ও সেই কাফেরদের মধ্যে হতে একজন মারা গেল। যখন এই গুপ্ত চোরের দল মদিনায় ফেরত আসল তখন পিছনে মক্কাবাসীরাও এসে পড়ল এবং অভিযেঙাগ করল যে, এভাবে আমাদের দুইজন পবিত্র স্থানের ভিতর মারা গেছে। যদিও পূর্বে এরা আঁ হজরতের প্রতি পবিত্র স্থানের ভিতর জুলুম ও অত্যাচার করত। সেহেতু এভাবে তাদের বিলাপ করার কোন বৈধতা ছিল না। তথাপি আঁ হজরতের সু-বিচার ও ইনসাফ দেখুন তিনি মক্কাবাসীদের বল্লেন, তোমাদের সঙ্গে অন্যায় হয়েছে। সুতরাং তিনি (সাঃ) সেই দুইজনের রক্তের প্রতিদান ঐ মৃত ব্যক্তিদের ওয়ারিশদেরকে দেওয়ালেন।.

হুদাইবিয়ার সন্ধিতে একটা শর্ত এও ছিল যে, "যে ব্যক্তি মুহাম্মদের সঙ্গে মিলিত হতে চায় সে মিলিত হতে পারে। মুহাম্মদ (সাঃ) এর সঙ্গীদের মধ্যে কেউ যদি কোরায়েশদের মধ্যে চলে যায় তাহলে তাকে ফেরত করা হবে না। যদি কোন পুরুষ সে মুসলমানই হোক না কেন মুসলমানদের নিকট মদীনা চলে গেলে তাহলে তাকে মক্কাবাসীদের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে। এখন লক্ষ্য করুন এই চুক্তিকে মহান ইনসাফকারী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর চরম উৎসাহকে বিসর্জন দিয়ে পূর্ণ করেছেন।

ঠিক সময়েই যখন এই চুক্তি লেখা হচ্ছিল কোরায়েশদের এক প্রতিনিধি শোহেল বিন উমরুর এক ছেলে আবু জান্দাল যে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল তাকে মক্কাবাসীরা ধরে বন্দী করে কঠোর শাস্তির মধ্যে রেখেছিল যে, কোন উপায়ে শিকল পরিহিত অবস্থায় উঠতে পড়তে পড়তে হুদাইবিয়ার ময়দানে পৌঁছে গেল। আর ঠিক সময় যখন তার বাপ শোহেল এই চুক্তি লিখছিলেন। আবু জান্দাল বেদনাদায়ক সূরে বলল :

"হে মুসলমানগণ! খোদার জন্যে আমাকে রক্ষা কর। মুসলমানগণ এই দৃশ্য দেখে কেঁপে উঠল কিন্তু শোহেল নিজের জিদ ধরল এবং রসূল (সাঃ)কে বলল এটা প্রথম চাওয়া যা আমি এই চুক্তি অনুসারে আপনার নিকট চাইছি, তা হল আবু জিন্দালকে আমার নিকট সোঁপে দিন। তিনি (সাঃ) বললেন এখনও পর্যন্ত এই চুক্তি পরিপূর্ণ হয় নি। শোহেল বলল যে, যদি আপনি আবু জান্দালকে ফিরিয়ে না দেন তাহলে এই চুক্তিকে বাতিল মনে করুন। আঁ হজরত সাঃ) শোহেলকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু পরিশেষে তার জিদের কারণে আবু জান্দালকে ব্যথিত স্বরে বললেন,

"হে আবু জান্দাল ধৈর্য ধারণ কর এবং খোদার প্রতি দৃষ্টি রাখ, খোদা তোমার জন্য ও তোমার মত দুর্বল মুসলমানদের জন্য অবশ্যই কোন পথ খুলবেন। কিন্তু এই সময় আমরা বাধ্য, কেননা মক্কাবাসীদের সঙ্গে চুক্তির কথা হয়েছে এবং আমরা এই চুক্তির বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ উঠাতে পারব না।

(সিরাত ইবনে হিশাম হালাত সুলাহ্ হুদাইবিয়া)

এটা এমন চুক্তি ছিল যে, হজরত উমর (রাঃ) এর মত বাহাদুর ব্যক্তির অবস্থাও পানির মত হচ্ছিল কিন্তু আঁ হজরত (সাঃ) উচ্চ হতে উচ্চতর উৎসাহের কুরবানী দিয়ে এই চুক্তির এক একটা শর্তকে পূর্ণ করেছেন। যার ফলে আল্লাহতা'লা ঐ হুদাইবিয়ার চুক্তির পর মাত্র তিন বছরের মধ্যে ১০হাজার পবিত্র সৈনিক সহ বিজয়ীর বেশে মক্কা বিজয়ে প্রবেশের সৌভাগ্য দান করেছেন।

শ্রোতামণ্ডলী! এমন একটা সময় ছিল যখন আঁ হজরত (সাঃ) বাইতুল্লার চাবি বাহক উসমান বিন তালহাকে বলেছিলেন যে, বাইতুল্লাহর দরজা খুলে দাও কিন্তু সে অস্বীকার করেছিল। তিনি বলেছিল হে উসমান দেখবে একদিন এই চাবি আমার নিকট হবে। সুতরাং মক্কা বিজয়ের শুভ লগ্নে তিনি (সাঃ) উসমান বিন তালহার নিকট হতে সেই চাবি নিয়ে নিলেন। এবং বাইতুল্লাহর দরজা উন্মুক্ত করে খানাকাবাকে মূর্তি হতে পবিত্র করলেন। হজরত আব্বাস (রাঃ) হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট নিবেদন করলেন যে, এখন এই চাবি বনু হাশিম কে দিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু সেই মহান ইনসাফকারীর প্রতি বিলীন হয়ে যান যে, তিনি সেই চাবি পুনরায় উসমান বিন তালহা কে ফিরিয়ে দিলেন, যে বহুকাল ধরে বাইতুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণকারী রূপে দায়িত্ব পালন করে আসছিল। আর বল্লেন এখন এই চাবি তোমার আর তোমার সন্তানদের নিকট থাকবে। অতঃপর উসমান বিন তালহা মুসলমান হয়ে গেল।

আঁ হজরত (সাঃ) মানুষের অধিকার আদায় করার প্রতি দৃষ্টি রাখতেন ঋণগ্রস্তদের ঋণ ফেরতের এত বেশি তাগিদ করতেন যে, যদি কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে জানতে পারতেন যে, এ ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেছে যে, তার উপর ঋণ পরিশোধ আবশ্যক হয়ে আছে তাহলে তিনি (সাঃ) তার জানাযা পড়াতেন না।

কোন ব্যক্তির দ্বারা কোন ব্যক্তি কষ্ট পেয়ে থাকলে বা কারোর প্রতি মনঃপীড়া হয়ে থাকলে যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট থেকে সে ক্ষমা প্রার্থী না হয় তিনি (সাঃ) তার প্রতি সন্তুষ্ট হতেন না। আর স্বয়ং তাঁর নিজের অবস্থা এই রূপ ছিল যে, সূরা নসর অবতীর্ণ হওয়ার পর (যার মধ্যে রসূলে করীম (সাঃ) এর মৃত্যুর ইঙ্গিত ছিল) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একটা খোতবা প্রদান করলেন যা শুনে লোকেরা খুব কাঁদলেন অতঃপর হুজুর (সাঃ) বললেন আমি তোমাদের সকলকে আল্লাহতা'লার শপথ দিয়ে বলছি যে, তোমাদের কারোর যদি আমার নিকট হতে কোন অধিকার বা প্রতিশোধ নেওয়ার থাকে তাহলে কেয়ামতের পূর্বে আজ এখনই নিতে পার। একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি আকাশা নামের দাঁড়িয়ে বলতে লাগল আমার পিতা মাতা আপনার প্রতি বিলীন হোক যদি আপনি বারবার শপথ দিয়ে একথা না বলতেন যে, প্রতিশোধ নিয়ে নাও তাহলে আমি কখনও আগে আসতাম না। আমি অমুক যুদ্ধে আপনার সঙ্গে ছিলাম, আমার উট হুজরের উটের নিকট যখন আসল তখন আমি আরোহিত অবস্থা হতে নেমে পড়লাম যেন আপনার পদচুম্বন করি। হুজুর যখন ছড়ি ঘোরালেন তা আমার লেগেছিল। আমি জানি না যে, হুজুর সেটা ইচ্ছা করে মরেছিলেন নাকি উটকে মেরেছিলেন। রসূলে করীম (সাঃ) বল্লেন, "আল্লাহতালার প্রতাপের শপথ খোদার রসূল তোমাকে জেনে শুনে মারতে পারে না।" সুতরাং হুজুর (সাঃ) বেলাল (রাঃ)কে বল্লেন "আমার সেই ছড়ি ঘর থেকে নিয়ে এস। হজরত বেলাল (রাঃ) গিয়ে হজরত ফাতেমা (রাঃ) এর নিকট হতে সেই ছড়ি নিয়ে আসলেন। রসূলে করীম (সাঃ) সেই ছড়ি আক্কাশা (রাঃ)কে দিলেন এবং বল্লেন তোমার প্রতিশোধ নিয়ে নাও। সুতরাং হজরত আবুবকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন আর বল্লেন তুমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর পরিবর্তে আমাদের নিকট হতে প্রতিশোধ নাও। হুজুর (সাঃ) হজরত অবুবকর (রাঃ) এবং হজরত উমর (রাঃ) কে বসিয়ে দিলেন। অতঃপর হজরত আলি (রাঃ) দাঁড়ালেন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর পরিবর্তে আমার নিকট প্রতিশোধ গ্রহণ কর। রসূলে করীম (সাঃ) তাঁকে থামিয়ে দিলেন। তারপর হজরত হাসান ও হোসেন (রাঃ) দাঁড়ালেন ও তারা বল্লেন আমরা রসূলে করীম (সাঃ) এর নাতী তাই আমাদের নিকট হতে প্রতিশোধ নেওয়া রসূলে করীম (সাঃ) এর নিকট হতে প্রতিশোধ নেওয়ার সমতুল্য। রসূলে করীম (সাঃ) তাদেরও নিষেধ করে দিলেন। আর আক্কাশাকে বললেন তুমি প্রতিশোধ নিয়ে নাও। আক্কাশা (রাঃ) বল্লেন যখন আপনার ছড়ি আমার শরীরে লাগে আমার শরীরে সে সময় কাপড় ছিল না। হুজুর (সাঃ) শরীর হতে কাপড় উঠালেন। তখন মুসলমানগণ পাগলেন ন্যায় কাঁদতে লাগল। এবং মনে মনে বলতে লাগল হে আক্কাশা ! তুমি কি আমাদের প্রভু (সাঃ)কে ছড়ি মারবে?

আক্কাশা (রাঃ) হুজুর (সাঃ) এর শরীরকে দেখেই লুফে নিতে এগিয়ে গেল আর তাঁর শরীরে চুম্বন করতে লাগল। এবং বলতে থাকল "আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি বিলীন হোক, আপনার নিকট হতে প্রতিশোধ নেওয়া কার মন সহ্য করতে পারে?"

রসূলে করীম (সাঃ) বল্লেন হয় প্রতিশোধ নিতে হবে নতুবা ক্ষমা করতে হবে। আক্কাশা নিবেদন করল হে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমি ক্ষমা করলাম। এই আশা নিয়ে যে, আল্লাহ্ ও কেয়ামতের দিন আমাকে ক্ষমা করবেন। নবী করীম (সাঃ) বল্লেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে আমার সঙ্গীকে দেখতে ইচ্ছুক সে এই বৃদ্ধকে দেখে নিক। অতৎপর মুসলমানগণ আক্কাশার কপাল চুমতে লাগল এবং তাকে মোবারক বাদ দিয়ে বলতে লাগল তুমি অতি উচ্চ স্থান প্রাপ্ত করে ফেলেছ।

(খাযমাউয বাওয়ায়েদ খঃ ৭পৃঃ ২৪৭, দারুল কেতাব আল আরাবী বেরুত)

সৈয়্যেদনা হজরত খলিফাতুল মসীহ ৫ম (আইঃ) বলেন : -

"এই জামানায় আমাদের আহমদীদের উপর সু-বিচার ও ন্যায়পরায়ণতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার এক বিশাল বড় দায়িত্ব অর্পিত হয়। কেননা আমরা এই কথার দাবীকারী যে, আমরা এই যুগের ইমামকে চিনেছি এবং তার বয়আতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। সেই ইমাম যাকে আঁ হজরত (সাঃ) হাকাম ও আদশ বলেছেন। সেই ইমাম যেখানে এই বিশেষত্বের অধিকারী হবেন, সেখানে তাঁর মান্যকারীদের নিকট হতেও এই আশাও করা যায় যে, তারাও সুবিচারের উচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত করুন।

হজরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, মরিয়ম পুত্র ন্যায় বিচারক ও ইনসাফকারী রূপে অবশ্যই অবতীর্ণ হবেন।

(মুসনদ আহমদ বিন হাম্বল খণ্ড ২ পৃঃ ৪৯৪ বেরুত)

আরও একটি বর্ণনা আছে যে, হজরত আলি (রাঃ) হজরত নবী করীম (সাঃ) এর ব্যাপারে বর্ণনা করছেন যে, তিনি (সাঃ) বলেছেন যে, যদি পৃথিবীর জীবনের একটা দিনও বাকী থাকে, তবুও আল্লাহতা'লা আমার আাহলে বয়াতের মধ্য হতে একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যে পৃথিবীকে সুবিচারে পরিপূর্ণ করবেন, যেরূপে তা পূর্বে অত্যাচার ও নিপীড়নে ভরে থাকবে।

(আবু দাউদ কিতাবুল ফিতন)

অর্থাৎ যেকোন অবস্থায় হোক না কেন ইমাম মাহদীর আগমন আবশ্যিক। আর কেয়ামতের পূর্বে তিনি আসবেন। যদিও কেয়ামতের আগমনে একদিনও থাকে না কেন তিনি আবির্ভূত হবেন তারপর এসব কিছু হবে। আমারা সৌভাগ্যবান যারা ইমাম মাহদী দেখেছি, চিনেছি। এবং তাঁর জামাতে শামিল হয়েছি। আর আঁ হজরত (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণীকে পুরো হতে দেখেছি।

হজরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন যে, এখন মসীহ মাওউদের সময়কাল চলে এসেছে, এখন যেকোন অবস্থাতে হোক না কেন খোদাতা'লা আকাশ হতে এমন ব্যবস্থার সৃষ্টি করবেন যা, যেরূপে পৃথিবী জুলুম ও অন্যায় রক্তপাতে পরিপূর্ণ ছিল, এখন তা সু-বিচার শান্তি ও মিলনে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং কল্যাণ মণ্ডিত সেই আমীর বা বাদশাহ্গণ যারা এ-হতে কিছু লাভবান হবে।

(গভর্নমেন্ট ইংরেজি ও জেহাদ, রুহানী খাযায়েন খণ্ড ১৭, পৃষ্ঠা : ১৯)

আল্লাহতা'লার নিকট দোয়া করি যে, আমাদের ইমাম (আইঃ) এর সমস্ত ক্রিয়া কলাপে কল্যাণ দান করুন। এবং অতি শীঘ্রই পৃথিবীতে সু-বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্টিত হোক এবং অশান্তির জামানা নিঃশেষ হোক। আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন পৃথিবী রসূল প্রেমী অর্থাৎ এই জামানার ন্যায় বিচারক ও ইনসাফকারী ইমামকে মান্য করে এবং তাঁর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

নবুয়তের প্রাথমিক যুগের কতিপয় ঘটনা

হযরত মহম্মদ (সা.) হিরা গুহার নির্জনতায় নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্টের আর্তি নিয়ে অশ্রু বিসর্জন করেন নি, বরং মানুষ কিভাবে শয়তানের কবল থেকে মুক্তি লাভ করে দয়ালু খোদার বান্দায় পরিণত হবে এই জন্য তিনি ব্যকুল ছিলেন। তাঁর তীব্র বাসনা ছিল যে, মিসকীন, এতীম, অসহায়, বিধবা ও ক্রীতদাস সমেত সমস্ত বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষ যেন নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেয়ে খোদার করুনার ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করে। তাঁর ইচ্ছা ছিল, মিথ্যা উপাস্যের পরিবর্তে যেন প্রকৃত উপাস্যের ইবাদত করা হয় এবং মানুষ সেই সত্তাকে সনাক্ত করেন যিনি যাবতীয় শক্তির আধার, যার সৌন্দর্য্য তাঁর উপর প্রকাশিত হয়েছিল। এই অকৃত্রিম প্রার্থনা ও আকুতি খোদার করুনা বারিকে আকর্ষণ করল। তিনি সেই বিস্ময়কর বিধিপত্র প্রাপ্ত হলেন যার দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবতার সংশোধন হতে পারে। তাঁর উপর কুরআন করীম অবতীর্ণ হতে শুরু করল। আল্লাহ্ তা'লা বলেন- হে চাদরাবৃত ব্যক্তি!

চাদরাবৃত দুর্বল ব্যক্তিটি কেঁপে উঠল। এটি অনেক বড় দায়িত্ব ছিল, কিন্তু প্রিয় খোদার সাহায্যের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি নিজ প্রভুর আদেশে নতশির হলেন। এইরূপে তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী অর্থাৎ আওয়ালুল মুসলেমিন রূপে অভিহিত হলেন।

মানুষদেরকে খোদার নামে অবহিত করার কাজ তিনি সর্বপ্রথম নিজের ঘর থেকে শুরু করেন। তিনি নিজের সহধর্মিনী হযরত খাদিজা (রা.)কে একশ্বেরবাদের শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁর জন্য এই পয়গাম কোন নতুন ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর একাত্মতা ছিল। তিনি কখনো কখনো হিরা গুহাতেও যেতেন। তিনি খুব ভালভাবে জানতেন যে, সত্যান্বেষী পথিক গন্তব্য পেয়ে গিয়েছে। কোন প্রতিবাদ ছাড়াই কোন প্রমাণ বা নিদর্শন না চেয়ে তাঁর নবুয়তের সত্যতাকে স্বীকার করলেন। এইভাবে তিনি প্রথম মুসলমান মহিলা হওয়ার গৌরব লাভ করলেন।

ইবনে হিশশাম বলেন, আমার নিকট একজন বিশ্বস্ত লোকের বর্ণনা পৌঁছেছে যে, জিবারাইল (আ.) মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে,

" খাদিজাকে তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালাম বলে দাও"

মহানবী (সা.) বলেন- হে খাদিজা! জিবরাঈল খোদার পক্ষ থেকে তোমাকে সালাম বলছে।

খাদিজা বলেন- আল্লাহ শান্তি, তিনি শান্তির উৎস। জিবরাঈল (আ.)-এর উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। (ইবনে হিশশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা:)

ইসলামের জ্যোতিতে আলোকিত হওয়া এটিই ছিল প্রথম পরিবার। এখান থেকেই আল্লাহ্ তা'লার বাণীর প্রসার হতে শুরু করে। হযরত খাদিজা (রা.) প্রথম মসুলমান মহিলা হওয়ার বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারীনি হওয়ার পাশাপাশি ইসলামের প্রচার কার্য করার সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছে। তিনি মক্কার মহিলাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের এবং হযরত মহম্মদ (সা.)-এর নবুয়তের বাণী প্রচার করতেন। একজন সংস্কৃতিমনষ্কা ও বিশ্বস্ত মহিলার দ্বারা ইসলামের দিকে আহ্বান করার সুপ্রভাব পড়া স্বাভাবিক। আসুন দেখি আল্লাহ্ তা'লার রসুলের সঙ্গ দেওয়ার জন্য পুরুষদের মধ্যে প্রথম কাকে নির্বাচন করলেন।

যেদিন হযরত রসুল করীম (সা.) নবুয়তের দাবী করেন, হযরত আবু বাকার (রা.) মক্কায় ছিলেন না। তিনি মক্কা থেকে কোথাও বাইরে গিয়েছিলেন। যেহেতু প্রখর গ্রীষ্ণকাল ছিল, তাই তিনি মক্কায় ফিরে এসে তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তিনি (রা.) হেলান দিতে যাবেন এমন সময় তাঁর বন্ধুর সেবিকা বলে উঠল-হায় হায়! এর বন্ধু তো উন্মাদ হয়ে গিয়েছে।

হযরত আবু বাকার (রা.) এদিক এদিক দেখলেন এবং মনে করলেন হয়তো এই কথাটি আমার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। তাই তিনি সেই বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন কোন বন্ধুর কথা বলছ? সে বলল- তোমার বন্ধু মহম্মদ।

হযরত আবু বাকার (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে?

সেই সেবিকা বলল যে, সে বলে আমার সাথে ফিরিস্তা কথা বলে। হযরত আবু বাকার (রা.) এই কথা শুনে শুতে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের চাদরটি কাঁধের উপর নিয়ে নিলেন এবং বন্ধুকে বললেন আমি এখন আসি। সেই বন্ধু বলল, একটু বিশ্রাম করে যাও। এখন প্রচণ্ড গরম। আপনি এখন গেলে কষ্ট হবে। তিনি (রা.) বললেন আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না।

তিনি সোজা হযরত মহম্মদ (সা.)-এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন এবং বলেন আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। আপনি কি একথা বলেন যে, আপনার উপর আল্লাহ্র ফিরিস্তা অবতীর্ণ হয় এবং আপনি তারা আপনার সঙ্গে কথা বলেন? হযরত রসুলে করীম (সা.) চিন্তা করেন যে, ইনি আমার বন্ধু, আমাদের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। তিনি যেন হোঁচট না খান। তাই তিনি (সা.) হযরত আবু বাকার (রা.) বোঝানো উচিত বলে মনে করলেন। তিনি (সা.) বললেন-

আবু বাকার প্রথমে আমার কথা তো শোন, আসল ব্যাপার হল-

হযরত আবু বাকার (রা.) তৎক্ষণাৎ রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আমি আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করব না। আপনি শুধু এতটুকু বলুন যে, আপনি কি বলেছেন যে, আপনার উপর ফিরিসতা নাযিল হয় এবং তারা আপনার সাথে কথা বলে? হযরত মহম্মদ (সা.) পুনরায় বললেন, আবু বাকার আমার কথা তো শোন।

তিনি (সা.) মনে করলেন যে, যদি হঠাৎ বলে দিই তবে হয়তো তিনি হোঁচট খাবেন। তাই ভূমিকা স্বরূপ কিছু বলে নিই। কিন্তু হযরত আবু বাকার বললেন আমি আপনাকে খোদার শপথ দিয়ে বলছি আপনি আমাকে এসব কথা বলবেন না কেবল এতটুকু বলুন যে আপনি কি বলেছেন যে, আপনার উপর খোদার ফিরিসতা নাযিল হয়?

যখন তিনি (রা.) হযরত মহম্মদ (সা.)-কে আল্লাহ্ শপথ দিলেন এবং নিজের কথার উপর অটল থাকলেন তখন বাধ্য হয়ে বললেন-

" আবু বাকার, হ্যাঁ আমি বলেছি যে, আমার উপর খোদার ফিরিসতা নাযিল হয় এবং আমার সঙ্গে কথা বলে"

একথা শোনামাত্রই হযরত আবু বাকার (রা.) বললেন- "তবে আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আপনার উপর ঈমান আনলাম।

প্রথম যুগে বয়াত গ্রহণের পদ্ধতি ছিল এই যে, পুরুষরা হুযুর (সা.)-এর হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার করতেন যে, " খোদার উপর বিশ্বাস আনব, কোন প্রকারের শিরক করব না, যাবতীয় প্রকারের মন্দ কর্ম যেমন, চুরি, ব্যাভিচার, হত্যা, মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকব। কারোর উপর অপবাদ দিব না।" (বুখারী, কিতাবুল আহকাম)

(এরপর ১৯-এর পাতায়)

মহানবী (সা.)-এর অমর বাণী

● عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اللّٰهَ لَا یَنْظُرُ اِلٰی اَجْسَامِکُمْ وَلَا اِلٰی صُوَرِکُمْ وَلٰکِنْ یَنْظُرُ اِلٰی قُلُوْبِکُمْ ۔ (مسلم کتاب البر والصلۃ باب تحریم ظلم المسلم.....)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: আল্লাহ্ তা'লা না তোমাদের বাহ্যিক শরীরের দিকে দেখেন আর না তিনি তোমাদের চেহারার দিকে (সুশ্রী বা কুশ্রী কি না) দেখেন। বরং তিনি তোমাদের অন্তরসমূহের দিকে দেখেন। (তিনি দেখেন যে, তার মধ্যে কতখানি নিষ্ঠা ও সদিচ্ছা আছে) (মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলা)

● عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ اَبِیْ سُفْیَانَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ کَالْوِعَاءِ اِذَا طَابَ اَسْفَلُهُ طَابَ اَعْلَاهُ وَاِذَا فَسَدَ اَسْفَلُهُ فَسَدَ اَعْلَاهُ ۔ (ابن ماجہ ابواب الزھد باب التوقی علی العمل)

হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আঁ হযরত (সা.)কে বলতে শুনেছি যে, কর্ম হল একটি পাত্রে পড়ে থাকা বস্তুর ন্যায়। পাত্রে পড়ে থাকার বস্তুর নীচের অংশ ভাল হয় তবে তার উপরের অংশও ভাল হয়ে থাকে। আর তার নীচের অংশ যদি নোংরা হয় তবে উপরের অংশও নোংরা হয়ে যায়। (একই অবস্থা আমল বা কর্মের) (ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ)

● عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا یَشْکُرِ النَّاسَ لَا یَشْکُرِ اللّٰهَ ۔ (ترمذی باب ماجاء فی الشکر لمن احسن الیک)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় সে আল্লাহ্র প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়। অর্থাৎ কোন কোন ব্যক্তির কোন অনুগ্রহের ফলে যদি কারোর কোন উপকার হয় তবে সেখানে খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পাশাপাশি সেই উপকারী ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাও জরুরী। (তিরমিযী, বা মা জা আ ফিশশুকরে লেমান আহসানা ইলাইকা)

● عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کُلُّ اَمْرٍ ذِیْ بَالٍ لَا یُبْدَأُ فِیْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فَهُوَ اَقْطَعُ ۔

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন যে কাজ বিসমিল্লাহির রহমানের রাহীম ছাড়া শুরু করা হয় সেটি অসম্পূর্ণ এবং বরকত বিবর্জিত। (আল জামেয়ু সাগীর)।

● قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَرَّهٗ اَنْ یُّحِبَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اَوْ یُحِبَّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ فَلْیَصْدُقْ حَدِیْثَهٗ اِذَا حَدَّثَ وَلْیُؤَدِّ اَمَانَتَهٗ اِذَا اؤْتُمِنَ وَلْیُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهٗ ۔ (مشکوۃ باب الشفقۃ والرحمۃ علی الخلق بحوالہ بیہقی فی شعب الایمان)

মহানবী (সা.) বলেছেন, যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে ভালবাস এবং তোমরা কামনা কর যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলও তোমাদেরকে ভালবাসুক, তবে এর জন্য তোমাদের করণীয় হল-সবসময় সত্য কথা বলা, আমানত রক্ষা করা এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে সবসময় সদ্ব্যবহার করা। (মিশকাত)

● عَنْ جَابِرٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ: اَفْضَلُ الذِّکْرِ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَفْضَلُ الدُّعَاءِ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۔

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি আঁ হযরত (সা.)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, সর্বোত্তম স্মরণ হল কলেমা তওহীদ অর্থাৎ একথা স্বীকার করা যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং সর্বোত্তম দোয়া হল আল-হামদোলিল্লাহ। (তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত)

● جُبِلَتِ الْقُلُوْبُ عَلٰی حُبِّ مَنْ اَحْسَنَ اِلَیْهَا وَبُغْضِ مَنْ اَسَاءَ اِلَیْهَا ۔

এটি মানব প্রকৃতির মধ্যে নিহিত আছে যে, সে উপকারীকে ভালবাসে এবং কদাচারীকে ঘৃণা করে। (জামেয়ুস সাগীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২০)

● عَنْ اُمِّ هَانِیٍّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : یَا عَائِشَةُ لِیَکُنْ شِعَارُکِ الْعِلْمَ وَالْقُرْاٰنَ ۔ (مسند الامام الاعظم کتاب العلم صفحہ ۲۰)

হযরত উম্মেহানী (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- হে আয়েশা তোমার রীতি-নীতি কুরআন এবং জ্ঞান হওয়া উচিত। অর্থাৎ কুরআনের সঙ্গে তোমার এমন ভালবাসা থাকা উচিত যেন এর থেকে কাছের এবং প্রিয় বস্তু তোমার জন্য কিছুই না হয়। 'শিয়ার' (অভ্যাস) সেই পোশাককে বলা হয় যেটি দেহের সঙ্গে জুড়ে থাকে।

মুহাম্মদ পর হামারী জান ফিদা

কালাম হযরত হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ

মুহাম্মদ পর হামারী জান ফিদা হ্যায়
কি ওহ কোয়ে যাম কা রাহনুমা হ্যায়॥
মেরা দিল উস নে রওশন কার দিয়া হ্যায়
আন্ধেরে ঘার কা ওহ মেরে দিয়া হ্যায়॥
খবর লে এ মসীহা দরদে দিল কি
তেরে বীমার কা দম ঘুট রাহা হ্যায়॥
মেরা হার যাররা হো কুরবানে আহমদ
মেরে দিল কা এহী এক মুদ্দুয়া হ্যায়॥
উসি কে ইশক মে নিকলে মেরী জাঁ
কি ইয়াদে ইয়ার মেঁ ভি এক মাযা হ্যায়॥
মুহাম্মদ জো হামারা পেশওয়া হ্যায়
মুহাম্মদ জো কি মেহবুবে খোদা হ্যায়॥
হো উসকে নাম পার কুরবান সব কুছ
কি ওহ শাহেনশাহে হার দো সারা হ্যায় ॥
উসি সে মেরা দিল পাতা হ্যায় তাসকীন
ওহী এক রাহে দ্বীঁ কা রাহনুমা হ্যায়॥
মুঝে ইস বাত পর হ্যায় ফখর মাহমুদ
মেরা মা'শুক মেহবুবে খোদা হ্যায়॥

মহানবী (সা.)-এর প্রতি সালাম

ডক্টর মীর মহম্মদ ইসমাঈল (রা.)

বদর গাহে যী শানে খাইরুল আনাম, শফীউল ওরা মারজায়ে খাস ও আম
বাসাদ ইজযে মিন্নত বাসাদ এহতেরাম, ইয়েহ করতা হ্যায় আরয আপকা এক গুলাম॥
কি এ শাহে কোনাইন আলি মাকাম
আলাইকাস সালাতু আলাই কাসসালাম॥
হাসীনানে আলাম হুয়ে শারমার্গী, জো দেখা ওহ হুসন অউর ওহ নুরে জাবী
ফির উস পার ওহ আখলাক আকমাল তরী, কি দুশমন ভি কেহনে লগে আফরী॥
যহে খুলকে কামিল, যহে হুসনে তাম
আলাইকাস সালাতো আলাইকাস সালাম॥
খালায়েক দিল থে একী সে তাহী, বুতোঁ নে থি হক কি জাগাহ ঘের লি
যালালালত থি দুনিয়া পে ওহ ছা রাহী, কি তওহীদ ঢুন্ডে সে মিলতি না থি॥
হুয়া আপকে দম সে উসকা কায়াম
আলাইকাস সালাতো আলাইকাস সালাম॥
মুহাব্বত সে ঘায়েল কিয়া আপনে, দালায়েল সে কায়েল কিয়া আপনে
জাহালাত কো যায়েল কিয়া আপনে, শরীয়ত কো কামিল কিয়া আপনে॥
বায়াঁ কার দিয়ে সব হালাল ও হারাম
আলাইকাস সালাতো আলাইকাস সালাম॥
নবুয়ত কে থে জিস কাদার ভি কামাল, ওহ সব আপ মেঁ জমা হ্যাঁ লামহাল
সিফাতে জামাল ও সিফাতে জালাল, হার এক রঙ্গ হ্যায় বাস আদীমুল মিসাল॥
লিয়া জুলুম কা আফু সে ইন্তেকাম
আলাইকাস সালাতো আলাইকাস সালাম॥
মুকাদ্দস হায়াত অউর মুতাহ্হার মাযাক, ইতায়াত মেঁ ইয়াকতা ইবাদত মেঁ তাক
সোয়ারে জাহাঁ গীর ইকরাঁ বারাক, কি বাগুযাশত আয কাসার নীলি রওয়াক॥
মুহাম্মদ হি নাম অউর মুহাম্মদ হি কাম
আলাইকাস সালাতো আলাইকাস সালাম॥

****

মহানবী (সা.)-এর জীবনী

একজন আদর্শ দায়ী-ইলাল্লাহ্

মুজাহিদ আহমদ শাস্ত্রী, সম্পাদক, হিন্দি বদর অনুবাদ: মির্যা সফিউল আলাম, সহ-সম্পাদক,বাংলা বদর

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেন:

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

হে রসূল! তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা (মানুষের কাছে ভালভাবে) পৌঁছে দাও। (আল-মায়েদা: ৬৮)

এই দাওয়াত এবং তবলীগের পদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'লা বলেন:

فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ

অতএব এরই ভিত্তিতে তুমি (মানবজাতিকে) আহ্বান জানাও

(আশ্ শূরা: ১৬)

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (النحل: 126)

অর্থাৎ-তুমি প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান জানাও। আর তুমি সর্বোত্তম যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই তাদের সবচেয়ে ভাল জানেন যারা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুতহয়ে গেছে। আর তিনি হেদায়াতপ্রাপ্তদেরও সবচেয়ে ভাল জানেন। (আন- নাহল: ১২৬)

এই সকল আয়াত সমূহ থেকে জানা যায় যে, নবী করীম (সা.)-এর মূল ভূমিকা ছিল একজন দায়ী-ইলাল্লহ্র। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

অর্থাৎ- হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি এক সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহ্র দিকে তাঁর আদেশে এক আহ্বানকারী ও দীপ্তিমান সূর্যরূপে। (আল-আহযাব: ৪৫-৪৬)

হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র জীবনি অধ্যায়ন করলে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি (সা.) ইসলামের তবলীগকে অন্যান্য সকল কাজের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে ছিলেন এবং প্রত্যেক অবস্থা ও যুগে এর দাবী পুরন করার জন্য তিনি (সা.) সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিমগ্ন রেখেছিলেন। তাঁর দাওয়াতে ইলাল্লাহ্র কয়েকটি দিক সম্পর্কে আমরা আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শ, বাণী এবং তাঁর একনিষ্ঠ সেবক হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মওউদ (আ.)-এর লেখনীর আলোকে জানার চেষ্টা করব যাতে আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে উৎকৃষ্ট উপায়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করতে পারি। কেননা, উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্র কর্তব্য পালন করা আবশ্যক।

আল্লাহ্ তা'লা সূরা আলে ইমরানের ১০৫ নম্বর আয়াতে বলেন:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থাৎ-আর তোমাদের মাঝে এমন এক দল থাকা দরকার যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকাজ থেকে বারণ করবে। আর এরাই সফল হবে।

দাওয়াতে ইলাল্লাহ্র প্রতি উৎসাহী করে তোলা

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে : হযরত সুহেল বিন সাআদ (রা.) রেওয়াত আছে যে, নবী করীম (সা.) হযরত আলী (রা.) কে সম্বোধন করে বলেন: খোদার কসম! তোমার মাধ্যমে একজন মানুষের হিদায়াত লাভ করা তোমার জন্য উৎকৃষ্ট প্রজাতির লাল উঁট লাভের চেয়েও শ্রেয়। (মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল)

পুণ্যকর্মের দিকে আহ্বান করার শুভপরিণাম

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসুলে করীম (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি পুণ্যকর্ম এবং হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে সে ততখানি নেকির অংশীদার হয় যতখানি পুণ্য সেই পুণ্যকর্ম সম্পাদানকারী লাভ করে থাকে। কিন্তু তার পুণ্যে বিন্দুমাত্র ঘাটতি হয় না। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দকর্ম এবং ভুল পথের দিকে আহ্বান করে সেও ততখানি পাপের ভাগীদার হয় যতখানি পাপ মন্দকর্ম সম্পাদানকারীর হয়ে থাকে। আর তার পাপে কোন অংশ কম হয় না।

(মুসলিম, কিতাবুল ইলম)

আঁ হযরত (সা.)-এর তবলীগি প্রচেষ্টা

হিজরতের কিছুকাল পূর্বে আঁ হযরত (সা.) হযরত আবু যার গাফফারীকে তার জাতিতে মুয়াল্লেম হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি (রা.) সেখানে গিয়ে ইসলামের তবলীগ করলে তার গোত্রের অর্ধেক মানুষ মুসলমান হয়ে যায়। এবং বাকী অর্ধেক বলল, তারা হুযুর (সা.)-এর হিজরতের পর ঈমান আনবে। রসূলে করীম (সা.) মদিনা এলে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের অনুসরণে আসলাম গোত্রও ইসলামের সামনে নতমস্তক হল। (মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল)

আঁ হযরত (সা.)-এর তবলীগের সূচনা

হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ সাহেব তাঁর অসাধারণ রচনা সীরাত খাতামুন্নাবীঈন-এ বলেন: মহানবী (সা.)-এর প্রকৃতিতে একাগ্রতা ও আত্মবিশ্বাস ছিল। তিনি (সা.) মানুষকে একত্ববাদের দিকে আহ্বান করতে আরম্ভ করলেন এবং শিরকের বিরুদ্ধে শিক্ষা প্রদান করতে লাগলেন, কিন্তু তিনি গোড়ার দিকে তিনি (সা.) এই মিশনকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন নি। বরং অত্যন্ত নীরবে গোপনীয়তার সাথে কাজ শুরু করেন এবং কেবল নিজের ব্যক্তিগত পরিসরে আনাগোনা ছিল এমন মানুষদের মধ্যেই তিনি নিজের শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখেন। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃষ্ঠা: ১২০)

নিকটাত্মীয়দেরকে আঁ হযরত (সা.)-এর নিমন্ত্রণ

আঁ হযরত (সা.) হযরত আলি (রা.) কে বলেন, একটি নিমন্ত্রনের ব্যবস্থা কর যেখানে আব্দুল মুতালেবের বংশধরকে আমন্ত্রিত কর যাতে এর মাধ্যমে তাদের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছে দেওয়া যায়। হযরত আলি নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করলেন। এবং তিনি রসুল করীম (সা.)-এর প্রায় চল্লিশ জন নিকটাত্মীয়কে এই দাওয়াতে সামিল করলেন। তাদের খাওয়ার শেষ পর্যায়ে তিনি (সা.) কিছু বক্তব্য রাখতে চাইলেন, কিন্তু হতভাগা আবু লাহাব এমন একটি কথা বলে ফেলল যার ফলে সকলে ছত্রভঙ্গ হয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করল। হযরত রসূলে করীম (সা.) আলী-কে বললেন, এবারের সুযোগটি তো হাতছাড়া হয়ে গেল। আরও একবার দাওয়াতের ব্যবস্থা কর। তাঁর আত্মীয়বর্গ একদিন পুনরায় একত্রিত হল। তিনি (সা.) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, " হে আবু তালেবের বংশধরগণ! আমি তোমাদের নিকট এমন বিষয় নিয়ে এসেছি যে, এরপূর্বে কোন ব্যক্তি আমাদের গোত্রের প্রতি এর থেকে উৎকৃষ্ট বিষয় নিয়ে আাসে নি। আমি তোমাদেরকে খোদার দিকে আহ্বান করছি। যদি তোমরা আমরা কথা মেনে নাও তবে তোমরা বস্তুজগত ও ধর্মজগতের সর্বোত্তম নিয়ামতরাজির উত্তরাধিকারী হবে। এখন বল! তোমাদের মধ্যে কে এই কাজে আমার সাহায্যকারী হবে? সকলেই নীরব ছিল, বৈঠকের মধ্যে স্তব্ধতা নেমে এসেছিল, হঠাৎ এক কোণ থেকে বছর তেরোর এক শীর্ণকায় বালক চোখে অশ্রুজল নিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং বলে উঠল, "যদিও আমি সব থেকে দূর্বল এবং সব থেকে ছোট, কিন্তু আমি আপনার সঙ্গ দিব।" এটি ছিলেন হযরত আলি (রা.)। আঁ হযরত (সা.) হযরত আলির কথা শুনে আত্মীয়বর্গের দিকে চেয়ে বললেন, যদি তোমরা জানতে তবে এই বালকের কথা শুনতে এবং মেনে নিতে। সকলে এই দৃশ্য দেখে শিক্ষা গ্রহণ করার পরিবর্তে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। আবু লাহাব তার বড় ভাই আবু তালেবকে বলল, দেখ! মুহাম্মদ এখন তোমাকে নিজের পুত্রের অনুবর্তিতা করার আদেশ দিচ্ছে। " এরা সকলে ইসলাম এবং আঁ হযরত (সা.) -এর দুর্বলতাকে উপহাস করতে করতে সেখান থেকে বিদায় নিল। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃষ্ঠা: ১২৮-১২৯)

দাওয়াতে ইলাল্লাহ এবং মক্কার কুরায়েশদের আচরণ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, মুশরিকগণ অপবিত্র, নিকৃষ্টতম জীব, নির্বোধ, শয়তানের বংশধর এবং তাদের উপাস্য জাহান্নামের ইন্ধন ও অংশ, তখন

আবু তালেব আঁ হযরত (সা.)-কে ডেকে বলেন-

হে আমার ভাইপো! তোমার গাল-মন্দ শুনে জাতি বেজায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। খুব সম্ভব তারা তোমাকে ধ্বংস করে দিবে এবং তার সঙ্গে আমাকেও । তুমি তাদের জ্ঞানীজনদেরকে নির্বোধ আখ্যায়িত করেছ এবং তাদের সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গকে নিকৃষ্টতম জীব বলেছ। তাদের সম্মানীয় উপাস্যদেরকে জাহান্নামের আগুন ও ইন্ধন বলেছ। এবং সকলকে অপিত্র এবং শয়তানের বংশধর বলেছ। আমি তোমার মঙ্গলের জন্য বলছি, নিজের ভাষাকে সংযত কর এবং গাল-মন্দ থেকে বিরত হও। নচেত আমি পুরো জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি রাখি না।

আঁ হযরত (সা.) উত্তরে বললেন-

হে চাচা! এটি গাল-মন্দ নয়। বরং এটি হল সত্য উদ্ঘাটন এবং যথোচিত বর্ণনা। এই কাজের জন্যই তো আমি প্রেরিত হয়েছি। এর কারণে যদি আমার মৃত্যুও আসে তথাপি আমি সানন্দে নিজের জন্য সেই মৃত্যুকে বরণ করব। আমার জীবন এই পথেই উৎসর্গিত। আমি মৃত্যুর ভয়ে সত্য প্রকাশ থেকে বিরত হতে পারি না।

হে চাচা! যদি তুমি নিজের দুর্বলতা ও কষ্টের কথা চিন্তা কর তবে আমাকে আশ্রয় প্রদান করা নিরস্ত হও। খোদার কসম! আপনাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি খোদার আদেশ পৌঁছানোর কাজে কখনো থেমে থাকব না। খোদার আদেশ আমার প্রাণের চেয়ে বেশি প্রিয়। খোদার কসম! যদি আমি এই পথে মৃত্যু বরণ করি, তবে এই আকাঙ্খাই পোষণ করি যেন পুনরায় জীবিত হয়ে বার বার এই পথেই মৃত্যু বরণ করতে থাকি। এটি ভীতির স্থল নয়। বরং তাঁর পথে দুঃখ সহন করার মধ্যে আমি অসীম আনন্দ খুঁজে পাই।

আঁ হযরত (সা.) এই বক্তব্য রাখছিলেন তখন তাঁর চেহারায় সত্য ও জ্যোতির আভা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হচ্ছিল। তাঁর (সা.) বক্তব্য শেষ হওয়ার পর সত্যের জ্যোতিঃ দেখে আবু তালেবের চোখ থেকে অশ্রুধারা বয়ে যেতে লাগল। তিনি বললেন-

আমি তোমার এই বিচিত্র রূপ সম্পর্কে অবগত ছিলাম না। তুমি অসাধারণ গুণ ও নিদর্শনের আধার। যাও! নিজের কাজে মগ্ন হয়ে পড়। যতদিন পর্যন্ত আমি জীবিত আছি, যতদুর পর্যন্ত আমার শক্তি আছে, তোমার সঙ্গ দিব।

(হযরত মসীহ মওউদ আ. টীকায় লিখেছেন: আবু তালেব সংক্রান্ত ঘটনাবলী যদিও বিভিন্ন পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু এই সমস্ত লেখনী ইলহামী যা খোদা তা'লা এই অধমের উপর অবতীর্ণ করেছেন। কেবল কোন কোন বাক্য ব্যাখ্যার জন্য আমার পক্ষ থেকে লেখা হয়েছে।)

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১০-১১১)

তায়েফবাসীদেরকে ইসলামের তবলীগ এবং তাদের আচরণ

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ. বলেন: শিয়াবে আবু তালেব-এ অবরোধ উঠে যাওয়ার পর তিনি (সা.) পুনরায় তবলীগ আরম্ভ করেন। তিনি বলেন: অবরোধ উঠে যায় এবং আঁ হযরত (সা.) চলাফেরার ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাধীনতা পেলেন, তখন তিনি তায়েফ যাওয়ার জন্য মনস্থির করলেন এবং সেখানে গিয়ে মানুষকে ইসলামের তবলীগ করলেন। তায়েফ একটি বিখ্যাত স্থান যা মক্কার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে চল্লিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত এবং সেই যুগে এই শহরটি বানু সাকিফ গোত্রের মানুষের বাসস্থান ছিল। কাবার গুরুত্বকে পৃথক রাখলে তায়েফ প্রায় মক্কার সমতূল্য ছিল এবং সেখানে অনেক প্রভাবশালী ও ধন্যাঢ্য ব্যক্তি বাস করত। স্বয়ং মক্কাবাসীরাও তায়েফের গুরুত্বকে অকপটে স্বীকার করত।

لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ

" অর্থাৎ এই কুরআন যদি খোদার পক্ষ থেকে থাকে তবে এটি মক্কা বা তায়েফের কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির উপর কেন নাযেল করা হল না।" একথা মক্কাবাসীরাই বলত।

মোটকথা, শওয়াল ১০ নবুবীতে আঁ হযরত (সা.) তায়েফের উদ্দেশ্যে একাকী রওনা হলেন। কিম্বা কিছু বর্ণনা অনুযায়ী যায়েদ বিন হারিসও সঙ্গে ছিলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি (সা.) দশ দিন অবস্থান করেন এবং শহরের অনেক নেতা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাত করেন, কিন্তু মক্কার ন্যায় এই শহরেরও সেই সময় ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য হয় নি। সকলেই প্রত্যাখ্যান করে এবং বিদ্রুপের ছলে এড়িয়ে যায়। অবশেষে তিনি (সা.) তায়েফের সবথেকে বড় নেতা অব্দ ইয়ালিলের কাছে ইসলামের তবলীগ করেন। কিন্তু সেও সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে এবং উপহাস করে বলে, আপনি যদি সত্যবাদী হন তবে আপনার সাথে কথা বলার আমার সাহস নেই আর যদি মিথ্যাবাদী হন তবে আপনার সাথে কথা বলাই বৃথা। মক্কার যুবকদেরকে তাঁর কথা প্রভাব না ফেলে, সেই আশঙ্কায় সে আঁ হযরত (সা.) কে বলল, এখান থেকে চলে যাওয়াই আপনার জন্য উত্তম হবে। কেননা এখানে কেউই আপনার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত নয়। এরপর সেই হতভাগা শহরের ইতর ছেলেদেরকে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দেয়। আঁ হযরত (সা.) যখন শহর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এরা চিৎকার করতে করতে তাঁকে ধাওয়া করে এবং পাথর ছুড়তে করতে থাকে যার ফলে তাঁর সারা দেহ রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। তিন মাইল পর্যন্ত এরা আঁ হযরত (সা.)-এর পিছন পিছন গালি দিতে দিতে পাথর ছুড়তে থাকে।

তায়েফ থেকে তিন মাইল দূরে মক্কার রঈস উতবা বিন রাবিয়ার একটি বাগান ছিল। আঁ হযরত (সা.) সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন, দুষ্ট লোকেরা ক্লান্ত হয়ে ফিরে যায়। বাগানের একটি ছায়াঘন স্থানে দাঁড়িয়ে আঁ হযরত (সা.) আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন:

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُوْ ضُعْفَ قُوَّتِيْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِيْ وَهَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ اَللّٰهُمَّ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَ اَنْتَ رَبِّيْ

অর্থাৎ হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি আমার অক্ষমতা, পরিকল্পনাহীনতা এবং মানুষের কাছে আমার অসহায়ত্বের অভিযোগ তোমার কাছেই করছি। হে আমার খোদা! তুমি সর্বাপেক্ষা দয়ালু। দুর্বল ও অসহায়দের তুমিই তত্বাবধায়ক ও রক্ষক এবং তুমিই আমার প্রভু। ..... আমি তোমারই জ্যোতিতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কেননা তুমিই জুলুম ও অত্যাচারের অবসানকারী এবং তুমিই মানুষকে ইহকাল ও পরকালে নেয়ামতরাজির উত্তরাধিকারী বানাও।

উতবা ও শেবা সেই সময় বাগানে ছিল। তারা আঁ হযরত (সা.)-কে এমন অবস্থায় দেখে আত্মীয়তা বা জাত্যাভিমানের আবেগের তাড়নায় বা হয়তো অন্য কোন কিছু ভেবে তাদের উদ্দাস নামে এক খৃষ্টান ক্রীতদাসকে দিয়ে একগুচ্ছ আঙ্গুর পাঠিয়ে দিল। তিনি (সা.) তা গ্রহণ করে উদ্দাসকে সম্বোধন করে বললেন, তোমার পিতৃভুমি কোথায় এবং কোন ধর্মের অনুসারী? সে বলল আমি নেনোবার মানুষ এবং খৃষ্টধর্মের অনুসারী? তিনি (সা.) বললেন: এটি কি সেই নেনোবা যেটি খোদার পুণ্যবান বান্দা ইউনুস বিন মাত্তার বাসভূমি ছিল? উদ্দাস বলল: হ্যাঁ, কিন্তু আপনি ইউনুসের ব্যাপারে কি করে জানলেন? তিনি (সা.) বললেন, তিনি আমার ভাই ছিলেন। কেননা, তিনিও আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন আর আমিও আল্লাহ্‌র নবী। অতঃপর তিনি (সা.) আদ্দাসকে ইসলামের বাণী শোনালেন যা শুনে সে অত্যন্ত প্রভাবিত হল এবং আবেগ তাড়িত হয়ে নিষ্ঠাভরে আঁ হযরত (সা.)-এর হাতে চুম্বন দিল। উতবা এবং শেবা দূর থেকে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখে ফেলল। আদ্দাস তাদের কাছে ফিরে গেলে তারা জিজ্ঞাসা করল, আদ্দাস তোমার কি হয়েছিল যে তুমি ঐ ব্যক্তির হাতে চুমু দিচ্ছিলে? এই ব্যক্তি তোমার ধর্মকে নষ্ট করবে অথচ তোমার ধর্ম তার ধর্ম থেকে উত্তম।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আয়েশা (রা.) আঁ হযরত (সা.)-এর নিকট জানতে চান যে, আপনি কি কখনো ওহদের যুদ্ধের চেয়েও বেশি কষ্ট পেয়েছেন? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, আয়েশা! তোমার জাতির পক্ষ থেকে আমি ভয়ানক যাতনা ভোগ করেছি।" অতঃপর তিনি (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)কে তায়েফের ঘটনা শোনান। এবং বলেন এই সফর থেকে ফিরে আসার সময় পাহাড়ের ফিরিশতারা আমার কাছে এসে বলেন, আমাকে খোদা তা'লা আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি যদি আদেশ করেন তবে এই দুটি পাহাড়ের মধ্যে পিষে দিয়ে এদেরকে ধ্বংস করে ফেলি। তিনি (সা.) বললেন: না, কক্ষনো নয়। আমি আশা করি আল্লাহ্ তা'লা এদের মধ্য থেকেই এমন মানুষ সৃষ্টি করবেন যারা এক-অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত করবে। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃষ্ঠা: ১৮১-১৮৪)

বিভিন্ন মেলায় গিয়ে ইসলামের প্রচার

হজের দিনগুলিতে দূর-দূরান্তের প্রত্যেকটি অঞ্চল থেকে মানুষ এসে মক্কায় একত্রিত হত এবং পবিত্র শহরে বিশাল জনসমাবেশ হত। আঁ হযরত (সা.)-এর প্রথম থেকেই এই রীতি ছিল যে, তিনি এই সুযোগগুলিকে কাজে লাগাতেন এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ইসলামের প্রচার করতেন। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই তিনি (সা.) মক্কার কুরায়েশদের প্রতিই বেশি মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু শিয়াব আবু তালেবে মুসলমানদেরকে কুরায়েশরা আটক করে রেখে যখন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল সেই সময় আঁ হযরত (সা.) আরবদের অন্যান্য গোত্রের দিকে অধিক

মনোযোগ দিলেন। বন্দী থাকাকালীন তিনি (সা.) হজ্জের উদ্দেশ্যে আগমণকারী বিভিন্ন গোত্রের মানুষের কাছে যেতেন যখন কিনা পবিত্র শহর মক্কায় পূর্ণ শান্তি বিরাজ করত। এছাড়াও তিনি আক্কায ও বিভিন্ন জনসমাবেশে গিয়েও ইসলামের তবলীগ করতেন। কিন্তু মক্কার কুরায়েশরা এক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করল, কেননা তারা জানত যে, বিভিন্ন গোত্রের মানুষের ইসলাম গ্রহণ করা ও মক্কাবাসীর ইসলাম গ্রহণ প্রায় সমান বিপজ্জনক। সুতরাং কুরায়েশদের এই বিরোধীতার কারণেই আঁ হযরত (সা.) কোথাও কোন আশার আলো দেখতে পেলেন না, যদিও তিনি (সা.) বিভিন্ন গোত্রের ক্যাম্পে গিয়ে ইসলামের প্রচার করে আসতেন। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃষ্ঠা: ১৮১)

সুমামা বিন উসালকে তবলীগ এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসুল করীম (সা.) নাজাদের উদ্দেশ্যে একটি অশ্বারোহী দল পাঠালেন যাতে সুমামা বিন উসালকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে যে বানু হানীফার একজন সদস্য ও ইয়ামামাবাসীদের সর্দার ছিল। সাহাবাগণ মসজিদ নবুবীর একটি স্তম্ভের সঙ্গে তাকে বেঁধে রেখেছিলেন। রসুল করীম (সা.) তার কাছে গিয়ে বললেন, হে সুমামা! তোমার কি অভিপ্রায়? সে বলল মহম্মদ! (সা.), আমার অভিপ্রায় মন্দ নয়। যদি আমাকে হত্যা কর তবে তুমি একজন খুনি অপরাধীকে হত্যা করবে আর আমার উপর যদি অনুগ্রহ কর তবে একজন কৃতজ্ঞের উপর তোমার কৃপা হবে। যদি তুমি ধন-সম্পদের বাসনা কর তবে যা চাইবে দেওয়া হবে। রসুল করীম (সা.) পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে সুমামা! তোমার কি অভিপ্রায়? এর উত্তরে সুমমা বলল, আমার অভিপ্রায় আপনাকে বলে দিয়েছি। যদি আপনি আমাকে অনুগ্রহ করেন তবে আমাকে একজন কৃতজ্ঞ পাবেন আর যদি হত্যা করেন তবে এক খুনি অপরাধীকে হত্যা করবেন। আর আপনি যদি সম্পদ চান তবে তাও দিতে প্রস্তুত আছি। রসূল করীম (সা.) এই উত্তর শুনে বললেন, সুমামাকে ছেড়ে দাও। সুমামাকে ছেড়ে দেওয়া হলে সে মসজিদ সংলগ্ন একটি বাগানে গিয়ে স্নান করে মসজিদে নবুবীতে এসে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং মহম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল। হে মহম্মদ ! আল্লাহ্‌র কসম! এই পৃথিবীতে আপনার চেহারাই সব বেশি আমাকে ক্রোধান্বিত করত আর আজ দেখুন! আপনার চেহারাই আমার কাছে এই পৃথিবীতে সব থেকে প্রিয়। খোদার কসম! আপনার ধর্মের প্রতিই সবথেকে বেশি বিদ্বেষ ছিল, আর এখন আপনার ধর্মই আমার কাছে সবথেকে প্রিয়। খোদার কসম! আপনার শহরের প্রতি আমার সবথেকে বেশি বিদ্বেষ ছিল, আর এখন আপনার শহরই হল আমার প্রিয়তম শহর।

(বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)

ইহুদী শিশুর অসুস্থতার খোঁজখবর নেওয়া

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, এক ইহুদী শিশু নবী করীম (সা.)–এর খিদমত করত। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী করীম (সা.) তাকে দেখতে যান। তার মাথার কাছে বসে তিনি (সা.) তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বললেন। সেই ছেলেটি নিজের পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করল, যে পাশেই ছিল। তার পিতা বলল, আবুল কাসেম (সা.)-এর আনুগত্য কর। অতএব, সে ইসলাম গ্রহণ করল। নবী করীম (সা.) তার ঘর বেরিয়ে আসার সময় বলছিলেন- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْقَذَهٗ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য যিনি এই ছেলেটিকে আগুন থেকে মুক্তি দিলেন। (বুখারী, কিতাবুল জানায়েয)

তবলীগের জন্য উত্তম পরিকল্পনা

সাহাবাদের পরামর্শে মোহর তৈরীর বিষয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর পরিকল্পনাটি থেকে তাঁর নীতিগত দিকটির উপর আলোকপাত হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে তিনি (সা.) কিভাবে তবলীগের কাজে ঐ সমস্ত পথ অবলম্বন করতেন যা অভিষ্ট ব্যক্তিকে আকর্ষণ করার জন্য এবং তার হৃদয়ে সুপ্রভাব তৈরী করার জন্য জরুরী ছিল। এটি স্পষ্ট যে, যতদূর তবলীগের সম্পর্ক, কোন মোহর থাকা বা না থাকা একটি সম্পূর্ণ অতিরিক্তি বিষয় এবং কলেমায়ে হক কোন মোহর ছাড়া বা মোহরের সঙ্গে একই প্রভাবসৃষ্টি করতে সক্ষম । কিন্তু আঁ হযরত (সা.)-কে বলা হয়েছিল যে সেই যুগের বাদশাহরা মোহরহীন কোন পত্রকে গুরুত্ব দিত না। তিনি (সা.) এমন কোন বিষয়কে উপেক্ষা করতে চাইতেন না যার কারণে সম্বোধিত ব্যক্তির হৃদয়ে কোন দৃষ্টিকোন থেকে অমনোযোগ সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ থাকতে পারে। এই কারণে তিনি (সা.) এই সাধারণ প্রস্তাবটিকেও অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করলেন যাতে তবলীগের প্রভাবকে কোন ভাবে দুর্বল করে দিতে পারে এমন কোন ঘাটতি না দেখা দেয়। جَادِلْهُمْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ- এটিই এই কুরআনী আয়াতের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ হে রসূল! সত্য ধর্মের প্রচারের বিষয়ে সবসময় সেই পথ অবলম্বন কর যা সম্বোধিত ব্যক্তির মন-মস্তিষ্কে সর্বোত্তম প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃষ্ঠা: ৭৯৮)

পত্রাবলীর মাধ্যমে তবলীগি অভিযান

" যে সমস্ত তবলীগি পত্রাবলী সেই সময় পাঠানো হয়েছিল সেগুলি আরবের চতুর্পার্শ্বে প্রশাসকদের নামে ছিল। অর্থাৎ উত্তরে রোমের বিখ্যাত সামাজ্যের অধিপতি কাইসারের নামে এবং দক্ষিণ-পূর্বে পারস্যের সম্রাট কিসরার নামে এবং আরবের উত্তর-পশ্চিমে মিশরের বাদশাহ মাকুকাশের নামে এবং পূর্বে ইমামার শাসক হুযাহ বিন আলির নামে। এবং পশ্চিমে ইথিওপিয়ার বাদশাহ নাজাশির নামে যিনি আফ্রিকা মহাদেশে একটি খৃষ্টান সাম্রাজ্যের শাসক ছিল। এবং কাইসারে অধীনে আরবের উত্তর সীমান্ত সংলগ্ন গুসসানের শাসকের নামে। অনুরূপভাবে তিনি আরবের দক্ষিণে ইয়ামানের শাসকরে নামেও একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন এবং আরবের পূর্বে বাহরীনের গভর্নরেরকেও একটি পত্র লিখেছিলেন। এইভাবে তিনি (সা.) আরবের চতুর্পার্শ্বে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু এমন ধারণা করা উচিত নয় যে, এই পত্রগুলি হুদাইবিয়ার সন্ধির অব্যবহিত পরেই একত্রে পাঠানো হয়েছিল। কেননা, হতে পারে কিছু কিছু চিঠি একত্রে পাঠানো হয়েছিল আবার কয়েকটি পত্র কিছুটা তফাৎ রেখে পাঠানো হয়েছিল। যাইহোক একথা সুনিশ্চিত যে, এগুলি সবই পাঠানোর কাজ আরম্ভ হয়েছিল হুদাইবিয়া সন্ধির পর। এবং সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম যে চিঠিটি লেখা হয়েছিল সেটি ছিল কাইসারে রোম অর্থাৎ হারকিল বাদশাহর নামে।" (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃষ্ঠা: ৭৯৮)

আরবের গোত্রসমূহকে ইসলামের দাওয়াত

"হজ্জের দিনগুলিতে আঁ হযরত (সা.) আরবের বিভিন্ন গোত্রের ঘাঁটিতে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান করতেন এবং বলতেন, আমি একজন প্রত্যাদিষ্ট নবী। যদি তোমরা আমাকে সত্য বলে মান্য কর এবং আমার সাহায্য কর তবে তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে কেন পাঠিয়েছেন। এই বিষয়ে উবাইদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি রাবিয়া বিন ইবাদকে এই ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি। রাবিয়া বলেন: আমি যখন যুবক ছিলাম আমার পিতার সাথে মিনায় অবস্থান করছিলাম। রসুলুল্লাহ্ (সা.) আরবের বিভিন্ন গোত্রের ঘাঁটিতে গিয়ে দাঁড়াতেন এবং বলতেন- হে অমুকের বংশধর! আমি আল্লাহ্‌র রসূল হয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। আমি তোমাদেরকে কেবল আল্লাহ্‌র উপাসনা করার এবং তাঁর সঙ্গে কারো শরিক না করার আদেশ দিচ্ছি। এছাড়া তোমরা যে সব দেব-দেবীর উপাসনা কর তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন কর। আমার উপর ঈমান আন, আমাকে সত্যবাদী হিসেবে গ্রহণ কর এবং আমার সহায়তা কর। অতঃপর আমি তোমাদেরকে সেই বাণী শোনাব যে বাণী সহকারে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পাঠিয়েছেন। আঁ হযরত (সা.)-এর বক্তব্য রাখার ঠিক পরেই আদনী পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বিরোধীতা করে বলে উঠত- হে অমুকের বংশধর! এই ব্যক্তি তোমাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে যে, 'লাত' ও 'উযযা'-কে ত্যাগ কর এবং তোমাদের বন্ধু বনী মালিক বিন আকিশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার আমন্ত্রণকে গ্রহণ করার ডাক দিচ্ছে যা সম্পূর্ণরূপে বিদাত এবং পথ-ভ্রষ্টতার নামান্তর। তোমরা কক্ষনো এর কথা কথা শুনবে বা স্বীকার করবে না। আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম এই ব্যক্তি কে যে ঐ ব্যক্তির বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রত্যাখ্যান করছে। তিনি বললেন, এই ব্যক্তি তাঁরই চাচা আব্দুল উযযা আবু লাহাব বিন আব্দুল মুতালেব।" (তারিখ তিবরী, ২য় খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃষ্ঠা: ৮৮)

আঁ হযরত (সা.)-এর ইসলামের তবলীগ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- লক্ষ্য করুন! সেই মহান পুরুষের কতই না উচ্চ মর্যাদা যিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের সংশোধন করলেন এবং তাদের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার অবস্থাকে শান্তি ও চুক্তিতে পরিবর্তিত করলেন। তাদের কুফর খণ্ড-বিখণ্ডিত হল এবং সত্য যাবতীয় আনুষঙ্গিকতা নিয়ে সম্পূর্ণরূপে তাদের সত্তায় পুঞ্জিভূত হল। তাদের হৃদয়ে সত্যের জ্যোতিঃ ফুটে উঠল এবং তাদের ললাটের রেখায় ঐশী ভালবাসার প্রহেলিকা এক উজ্জ্বল দ্যুতির ন্যায় প্রকাশ পেল। ধর্ম সেবার জন্য তাদের সাহসিকতা আকাশ ছুঁয়ে ফেলল। তারা মহম্মদের ধর্ম ইসলাম প্রচারের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এবং উত্তর ও দক্ষিনের দেশসমূহের দিকে রওনা হল। .....তারা ইসলামের জন্য নিজেদের প্রচেষ্টা এবং ত্যাগের ক্ষেত্রে

কোন ত্রুটি রাখে নি। তারা ইসলামকে চিন, রোম, পারস্য এবং সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। এবং যে যে স্থানে শিরক ও কুফর মাথা চাড়া দিয়েছিল সেখানেই তারা তারা পৌঁছেছিল। মৃত্যুর সামনে তারা পশ্চাদপদ হয় নি, যদিও তাদেরকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়েছে। " (নাজমুল হুদা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা: ৪১)

দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র সোনালী নীতি

(১) দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ এবং তবলীগের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: মোমেনরও উচিত স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দিকে লক্ষ্য রাখা। যেখানে নম্রতার প্রয়োজন সেখানে কঠোরতা অবলম্বন করা উচিন নয়। আর যেখানে কঠোরতা অবলম্বনা করা ছাড়া কাজ হচ্ছেনা বলে মনে হয় সেখানে কোমলতা দেখানোও পাপ। ফার্সি পঙক্তি: অর্থ- যদি তুমি স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা না কর তবে কুফর করার দোষে দুষ্ট হবে'

দেখ! ফেরাউন বাহ্যতঃ কেমন পাষাণ হৃদয় অস্বীকারকারী ব্যক্তি ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হযরত মূসা (আ.)-কে এই নির্দেশনাই দেওয়া হয়েছিল: فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا (তহা: ৪৫) রসূলে করীম (সা.)-এর জন্যও কুরআন শরীফে এই একই ধরণের আদেশ রয়েছে। وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا (আল-আনফাল: ৬২) মোমেন এবং মুসলমানদের জন্য কোমলতা ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করার আদেশ রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং সাহাবাগণেরও অনুরূপ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে-

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ
اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ-

মহম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল। আর যারা তার সাথে আছে তারা অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর (এবং) পরস্পরের প্রতি কোমল। (আল-ফাতাহ: ৩০)।

অপর এক স্থানে আঁ হযরত (সা.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ-

হে নবী! তুমি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও।

(আত-তওবা: ৭৩)

মোটকথা এই সকল আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে স্বয়ং খোদা তা'লাও স্থান, কাল, পাত্রকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মোমেনীন এবং ঈমানদারদের জন্য এটি কতই না নম্রতার আদেশ দেওয়া হয়েছে! (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫২৬)

(২) আঁ হযরত (সা.)-এর অসাধারণ অবিচলতা:

আঁ হযরত (সা.)-এর দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র মধ্যে অসাধারণ অবিচলতার নমুনা লক্ষ্য করা যায় যা সমস্ত আম্বিয়ার থেকে মর্যাদায় উচ্চ ছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: " রসূলে করীম (সা.)-এর দিকে লক্ষ্য কর! মক্কায় থাকাকালীন তিনি (সা.) কত কষ্টই না সহ্য করেছেন! তিনি (সা.) যখন তায়েফ গেলেন, তাঁকে পাথর মেরে রক্তাক্ত করে দেওয়া হল! তিনি আশ্চর্য হলেন যে, এটি কেমন যুগ! আমি কথা বললে মানুষ আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তিনি বললেন, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি এই দুঃখ সহন করে যাব যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি সন্তুষ্ট হও।

(আল-হাকাম, ১০ই অক্টোবর, ১৯০২)

(৩) আঁ হযরত (সা.)-এর তবলীগ:

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: " অতএব স্মরণ রেখ, নবীদের উপর যতক্ষণ পর্যন্ত ঐশী বাণী অবতীর্ণ না হয়, তাঁরা কিছুই বলতে পারেন না। কেননা, প্রত্যেক জিনিসের প্রকৃত সত্য কেবল মাত্র ওহীর দ্বারাই উন্মোচিত হয়। এই কারণেই আঁ হযরত (সা.)-কে আদেশ করা হয়- مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ অর্থাৎ তুমি জান না যে, কিতাব কি জিনিস এবং ঈমান কি জিনিস, কিন্তু তাঁর উপর যখন আল্লাহ্‌র ওহী অবতীর্ণ হল তাঁকে বলতে হল- وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (ইউনুস: ১০৫) অনুরূপভাবে তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের যুগে মক্কায় পৌত্তলিকতা, শিরক,দুবৃত্তি ও অন্যায়-অনাচার দেখা যেত। কিন্তু কেউ কি বলতে পারে যে, আল্লাহর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেও তিনি (সা.) মূর্তিদের বিরুদ্ধে উপদেশ দিতেন এবং প্রচার করেছেন, কিন্তু যখন فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ (আল-হিজর: ৯৫)-এর আদেশ করা হল, তিনি

এরপর ২১-এর পাতায়

(১৪-র পাতার পর.....)

মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে দশ-এগারো বছরের নিরিহ বালক আলি (রা.) যখন জানতে পারল যে, বড় ভাইয়ের উপর ফিরিস্তা নাযিল হয়েছে যে সঙ্গে করে ঐশী শিক্ষা নিয়ে এসেছে তখন সে পবিত্র মনে তা স্বীকার করে নেয়। এই ভাবে তিনি প্রথম মুসলমান বালক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এই বালকের আরও একটি বিশেষ সম্মান আছে। প্রথম প্রথম যখন নামায শেখানো হয় তখন মহানবী (সা.) তাকে সঙ্গে নিয়ে নামায পড়তেন। কখনো কখনো লোকচক্ষুর অন্তরালে কোন পাহাড়ী উপত্যকায় নামায পড়তেন। একবার তাঁরা দু'জন সকলের থেকে পৃথক হয়ে গোপনে নামায পড়ছিলেন এমতাবস্থায় কেউ আবু তালেবকে এবিষয়ে সংবাদ দেয়। আবু তালেব এসে তাদেরকে এভাবে ইবাদত করতে দেখে যারপরনায় বিস্মিত হন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে আমার ভাইপো! এটি তুমি কোন ধর্ম অবলম্বন করেছ? তিনি (সা.) বললেন-

হে আমার চাচা! এই ধর্ম হল খোদা ও তাঁর ফিরিস্তা এবং রসুলগণের এবং আমাদের পিতা ইব্রাহিমের। খোদা তা'লা আমাকে এই ধর্ম সহকারে রসুল করে পাঠিয়েছেন। হে আমার চাচা! আমি আপনাকে সত্য পথের দিকে আহ্বান করছি। আপনি এই ধর্ম গ্রহণ করুন এবং আমাদের সঙ্গ দিন। আবু তালেব বলল-

" হে আমার ভাতিজা! আমি আমার পূর্বপুরুষদের পথ ত্যাগ করতে পারি না, কিন্তু যতদিন আমি জীবিত থাকব শত্রুরা তোমাকে কষ্ট দিতে পারবে না।

এরপর আবু তালেব তার ছেলে আলি (রা.) জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি এ কি ধর্ম অবলম্বন করেছ? ছোট্ট আলি (রা.) উত্তর দিল-

আব্বাজান! আমি খোদা ও তাঁর রসুলের উপর বিশ্বাস এনেছি এবং সেই কিতাবের উপর যা খোদার রসুলের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এই নামাযও সেই ধর্মেরই অঙ্গ। আবু তালেব বললেন- মহম্মদ তোমাকে পুণ্যের দিকে আহ্বান করছে। তার সঙ্গ দিও।

হযরত উসমান (রা.) বিন উফফান হাতির ঘটনার পাঁচ বছর পর জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবে পড়ালেখা শিখেছিলেন। বড় হয়ে বানিজ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সততা ও বিশ্বস্ততার কারণে বানিজ্যে অনেক উন্নতি হয়েছিল। বানিজ্য দলের সঙ্গে তিনি হযরত আবু বাকার (রা.)-এর সঙ্গে থাকতেন। যখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) নবুয়তের দাবী করলেন তখন তাঁর বয়স আনুমানিক ত্রিশ বছর ছিল। তাঁকে সর্বপ্রথম হযরত আবু বাকার (রা.) বলেন যে, হযরত মহম্মদ (সা.) কে এক-অদ্বিতীয় খোদা ইসলাম ধর্ম সহকারে রসুল করে পাঠিয়েছেন।

এছাড়াও তাঁর এক খালা সায়াদী বিনতে কুরেয বর্ণনা করেন যে, 'মহম্মদ বিন আব্দুল্লাহ-এর কাছে জিবরাঈল অবতীর্ণ হন এবং এমন আলোকময় বাণী নিয়ে আসেন যেমন সূর্যোদয় হলে আলো ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর ধর্মে কল্যাণ আছে। কখনো তাঁর বিরোধীতা করো না অন্যথা চরম লাঞ্ছনা জুটবে। " তিনি (রা.) সৎ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি আলো সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি (রা.) স্বয়ং মহানবী (সা.) -এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত রসুলে করীম (সা.)-এর পর পর দুই কন্যার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। এই কারণেই তাঁকে দুই জ্যোতিঃ বিশিষ্ট বলা হয়।

হযরত আবু বাকার (রা.) -এর তবলীগের ফলে হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত সায়াদ বিন আবু ওয়াকাস (রা.) কেবল উনিশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। এই দুই জনই মহানবী (সা.)-এর মাতার গোত্র বানু যোহরা-র সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। এরা দুজনেই পুণ্যবান ছিলেন। হযরত যুবের বিন আল আওয়াম (রা.) মহানবী (সা.)-এর পিসতুতো ভাই ছিলেন। এবং হযরত তালহা (রা.) বিন উবাইদুল্লাহ্‌ও স্বল্প বয়সে ইসলামের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হন। দুই তিন বছরে দোয়া এবং তবলীগের পরিশ্রমের ফলে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা নগণ্যই ছিল। হযরত আবু উবাইদুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ বিন জাররাহ (রা.) হযরত উবাইদা বিন হারিস (রা.), হযরত আবু সালমা বিন আব্দুল আসাদ, হযরত আবু হুযাইফা (রা.) বিন উতবা, হযরত সাঈদ বিন যায়েদ, হযরত উসমান বিন মাযুয়ী, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাহাম, হযরত ওবাইদুল্লাহ (রা.) বিন জাহাশ, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ (রা.), হযরত বিলাল (রা.) বিন রাবাহ, হযরত আমের (রা.) বিন ফুহেরা, হযরত খাব্বাব বিন আল আরিস, হযরত আবু যার গাফফারি (রা.) হযরত আসমা বিনতে আবু বাকার (রা.) , হযরত ফাতিমা বিনতে খাততাব, আব্বাস বিন আব্দুল মুতালেবের স্ত্রী হযরত উম্মে ফযল (রা.)- এই কয়েকজন বালক ও যুবক ছিলেন যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বা যারা দরিদ্র, দূর্বল ও বৃদ্ধ ছিলেন। যাদেরকে নিজেদের পরিবার বা গোত্রের মধ্যে তেমন

এরপর ২৩-এর পাতায়

সেই পরমোপকারী ব্যক্তির উপর দিনে শত শত বার দরূদ প্রেরণ কর

কুরায়েশি আব্দুল হাকীম, বেঙ্গালুরু

অনুবাদ: মির্যা সফিউল আলাম

আকাশ ও পৃথিবীর অধিপতি মহান আল্লাহ্ তা'লা হযরত মহম্মদ মুস্তাফা (সা.) কে মানবতার সফলতা ও সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সমস্ত জগতের জন্য কৃপা স্বরূপ আবির্ভূত করেছেন। অর্থাৎ তাঁর সত্তার মধ্যে কেবলই কৃপা ও অনুগ্রহই বিরাজ করছে। তাঁর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হল, তিনি এমন একটি পরিপূর্ণ শরিয়ত পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করেছেন যা বিশ্ববাসীর জন্য কেবল একটি জীবনমার্গই নয়, বরং এটি মানব প্রকৃতির ফলকও বটে। মানব জাতির জন্য যে শরীয়ত তিনি উপস্থাপন করেছেন, তিনি (সা.)-সেটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মন ও প্রাণ দিয়ে অনুশীলন করেছেন। তিনি (সা.) এই শরীয়তকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করেছিলেন। একবার কোন এক সাহাবা হযরত আয়েশা (রা.) -কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আঁ হযরত (সা.)-এর চরিত্র কেমন ছিল? হযরত আয়েশা (রা.) উত্তর দিলেন: কানা খুলুকুহুল কুরআনু কুল্লুহঅর্থাৎ সমস্ত কুরআন তাঁরই চরিত্রের চিত্রাঙ্কন করেছে।

তিনি (সা.) এমন এক অন্ধকারময় যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যখন সর্বত্র কেবল শিরক, পথভ্রষ্টতা এবং সৃষ্টির উপাসনা খোদা তা'লা ও বান্দার সম্পর্ককে শেষ করে দিয়েছিল। এমন অন্ধকারময় যুগে তিনি (সা.) অকৃত্রিম একত্ববাদের প্রতিষ্ঠাকে জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে নির্ধারণ করলেন। এই মহান উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য তিনি (সা.) নিরন্তর প্রাণ ও সম্পদের কুরবানী উপস্থাপন করে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে অত্যন্ত ব্যকুল ও ব্যাথাতুর চিত্তে দোয়া করতে থাকেন যা দেখে পরম দয়ালু খোদা তা'লা তাঁকে সম্বোধন করে বললেন:

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ " হে মহম্মদ! তুমি নিজেকে এই দুঃখে ধ্বংস করে ফেলবে যে, তারা ঈমান কেন আনে না"।

আম্বিয়াগণের ইতিহাসে কোন নবীর জন্য আল্লাহ্ তা'লা এমন বাক্য ব্যবহার করেন নি এবং কারোর জন্য এত চিন্তা প্রকাশ করেন নি।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: " আমি সর্বদা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করি যে,এই যে আরবী নবী যাঁর নাম 'মুহাম্মদ' (তাঁর প্রতি হাজার হাজার দরুদ ও সালাম), তিনি কতই না উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর উচ্চ অবস্থান বা মোকামের সীমা কল্পনাও করা যায় না এবং তাঁর পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ও কার্যকারিতার সঠিক অনুমান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আফসোস যে, তাঁর মর্যাদা যেভাবে সনাক্ত করা উচিত ছিল, সেভাবে সনাক্ত করা হয় নি। সেই তওহীদ যা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তিনিই একমাত্র বীরপুরুষ, যিনি তা দুনিয়াতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষের প্রতি ভালবাসায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। এজন্যই খোদা, যিনি তাঁর (সা.) হৃদয়ের রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সমস্ত নবী ও সমস্ত প্রথম ও শেষের ব্যক্তিগণের অর্থাৎ আউয়ালীন ও আখেরীনদের উপরে উন্নীত করেছেন। এবং তাঁর কাঙ্খিত সকল প্রত্যাশাই তাঁর জীবনের পূর্ণক করে দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক কৃপা ও কল্যাণের ঝরণার উৎস। যে ব্যক্তি তাঁর কৃপা ও কল্যাণসমূহ স্বীকার না করেই কোনও প্রকারে কোনও শ্রেষ্ঠত্বে দাবী করে সে মানুষ নয়, সে শয়তানের বংশধর। কেননা, প্রতিটি শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে। এবং প্রত্যেক মারেফাতের (জ্ঞান ও প্রজ্ঞার) ভাণ্ডার তাঁকেই দান করা হয়েছে। যে তাঁর মাধ্যমে না পায়, চির বঞ্চিত। আমি কী বস্তু, আমার আছেই বা কি! আমি নেয়ামত বা উত্তম পুরস্কারের অস্বীকারকারী হব, যদি না আমি একথা স্বীকার করি যে, প্রকৃত তওহীদ আমি ঐ নবীর মাধ্যমেই লাভ করেছি। জীবিত খোদার পরিচয় আমি পেয়েছি ঐ কামেল ও পূর্ণ নবীর মাধ্যমেই, তাঁরই আলোকের মধ্য দিয়ে। খোদার সাথে কথা বলার এবং সম্বোধিত হওয়ার, যার মাধ্যমে আমরা খোদার চেহারা দেখে থাকি-তার সৌভাগ্য লাভ করেছি ঐ মহান নবীরই মাধ্যমে। ঐ হেদায়াতের সূর্যের রশ্মিমালা আমার উপরে প্রখর রৌদ্রের ন্যায় পতিত হয় এবং তার মধ্যে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, ততক্ষণ আমি আলোকিত হতে থাকি।'

(হাকীকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা: ১১৫, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা: ১১৮-১২১)

স্যার উইলিয়াম মিউরও প্রাচ্যভাষাবিদ ছিলেন, তিনি অনেক কিছু বিপক্ষে লিখেছেন। তিনি এও লিখেছেন: " সৌজন্যবোধ তাঁর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল যার কারণে তিনি (সা.) একজন অতি সামান্য অনুসারীর প্রতিও যত্নবান ছিলেন। লজ্জাশীলতা, স্নেহ, ধৈর্য্য, বদান্যতা এবং বিনয় তাঁর চরিত্রের অন্যতম উজ্জ্বল বৈশিষ্ট ছিল। এই সকল গুণাবলীর কারণে তিনি (সা.) নিজের পরিবেশের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁর অনুরাগী বানিয়ে নিতেন। 'না' বলা তাঁর স্বভাবে ছিল না। কোন যাচঞাকারীকে কিছু না দিতে পারলে তিনি নীরব থাকতেন। কখনো এমনটি শোনা যায় নি যে, তিনি কোন আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন, সে নিমন্ত্রণ তুচ্ছ হলেও। তিনি কারোর দেওয়া উপহার কখনো নিতে অস্বীকার করেছেন, কখনো এমনটি ঘটেনি, সেটি যতই তুচ্ছ হোক না কেন। তাঁর একটি অনন্য বৈশিষ্ট ছিল এই যে, তাঁর কোন বৈঠকে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির মনে হত যে তিনিই হয়তো সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অতিথি। যদি তিনি কাউকে তার সফলতার জন্য প্রফুল্ল দেখলে উৎসাহের সঙ্গে তার সাথে করমর্দন ও আলিঙ্গন করতেন। বঞ্চিত ও দৈন্যপীড়িতদের প্রতি তিনি অত্যন্ত কোমলতার সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করতেন। ছোটদেরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। পথ চলতি বালকদেরকে সালাম করতে তিনি কোন দ্বিধা করতেন না। দুর্ভিক্ষের সময়ও তিনি নিজের খাবার অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতেন এবং প্রত্যেকের কষ্ট ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করতেন। কোমল ও দয়ালু স্বভাব তাঁর প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল। মহম্মদ (সা.) একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। তিনি আবু বাকার-কে ভাইয়ের মত ভালবাসতেন। আলিকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন। যায়েদ যিনি স্বাধীনকৃত ক্রীতদাস ছিলেন, তিনি এই স্নেহপরায়ণ নবীর সঙ্গে এত বেশি একাত্ম ছিলেন যে, নিজের পিতার সঙ্গে যাওয়ার পরিবর্তে মক্কায় থেকে যাওয়া পছন্দ করেন। তাঁর অনুগ্রাহীকে জাপটে ধরে তিনি বললেন, আমি আপনাকে ছেড়ে যাব না। আপনিই আমার পিতা-মাতা।' বন্ধুত্বের এই সম্পর্ক যায়েদের মৃত্যু পর্যন্ত টিকে ছিল। অতঃপর পিতার কারণে যায়েদের পুত্র উসামার সঙ্গেও মহম্মদ (সা.) অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ আচরণ করতেন। উসমান এবং ওমর-এর সঙ্গেও তাঁর বিশেষ অনুরাগের সম্পর্ক ছিল। হুদাইবিয়ায় বায়তে রিজওয়ানের সময় নিজের অবরুদ্ধ জামাতাকে রক্ষা করার জন্য জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করার যে অঙ্গিকার করেন, সেটি সেই অকৃত্রিম বন্ধুত্বেরই একটি দৃষ্টান্ত। আরও অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেগুলিকে মহম্মদের আকুল ভালবাসার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন ক্ষেত্রেই এই ভালবাসা অকারণ ছিল না, বরং প্রত্যেকটি ঘটনা পারস্পরিক উদ্দীপ্ত ভালবাসা ও আত্ম-ত্যাগের প্রেরণায় সমৃদ্ধ ছিল।"

তিনি আরও লিখেন, " ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার পরও তিনি ন্যায়পরায়ণ এবং সংযমী থেকেছেন। তিনি সেই সব শত্রুদের প্রতি মিতাচারের ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি রাখতেন না যারা তাঁর দাবিসমূহকে সানন্দে স্বীকার করে নিত। মক্কাবাসীর দীর্ঘ ও অদম্য উৎপীড়নের শিকার মক্কা জয়ী মহম্মদ বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে আগুন ও রক্তের হোলি খেলতে পারত। কিন্তু মহম্মদ (সা.) কয়েকজন অপরাধী ছাড়া সার্বজনীন ক্ষমার ঘোষণা করলেন এবং অতীতের সমস্ত তিক্ততাকে নিমেষের মধ্যে ভুলে গেলেন। তাদের সকল, বিদ্রুপ, লাঞ্ছনা এবং অত্যাচার-নিপীড়ন সত্বেও তিনি নিজের প্রধান শত্রুর সঙ্গেও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করেছেন। মদিনাতে আব্দুল্লাহ্ এবং অন্যান্য বীতরাগ সঙ্গী (অর্থাৎ যারা মুনাফেকীন ছিল) যারা বছরের পর বছর ধরে তাঁর পরিকল্পনাতে বাধা দিয়ে যাচ্ছিল এবং কর্তৃত্বের

বিরোধীতা করে আসছিল, তাদেরকে ক্ষমা করাও একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। অনুরূপভাবে তিনি ঐসকল গোত্রের সঙ্গেও মিতাচার করেছেন যারা তাঁর ঘোর শত্রু ছিল। বিজয়ের পূর্ব মূহুর্তেও তারা কঠোর বিরোধীতা করেছিল।"

The Life of Mahomet by William Muir, Vol-IV, London: Smith, Elder and Co.65 Cornhil, 1861, pp. 305-307)

মানবীয় মূল্যবোধ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্যে তিনি (সা.) খোদা প্রদত্ত পবিত্রকরণ শক্তি দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন এবং উত্তম আচরণ ও ভালবাসার এমন পাঠ দিয়েছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ করে রাখবে।

সৃষ্টির উন্মেষলগ্ন থেকেই নারীজাতি অত্যাচারিত এবং নিপীড়িত হয়ে এসেছে। সে ছিল অসহায়। আমাদের জীবন সেই পরমোপকারী মহাত্মার উদ্দেশ্যে নিবেদিত, যিনি নারী জাতিকে শুধু তাদের অধিকারই দেন নি বরং তিনি (সা.) সন্তানের জন্য জান্নাতের চাবিকাঠি মায়ের চরণতলে রেখে দিয়েছেন। কুরআন করীম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কোন ঐশী গ্রন্থে নারীদের অধিকার সম্পর্কে এত বিস্তারিত বর্ণনা হয় নি। আমরা প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি যে, নারীজাতিকে সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার কুরআন মজীদ প্রদান করেছে তা কোন ঐশী গ্রন্থ দেয় নি। এটি কেবল কুরআনী আদেশের অনুগ্রহ যার কারণে আজ পৃথিবীর প্রত্যেকটি মহিলা নিজেদের পূর্বপুরুষদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছে।

তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেও এবং নবুয়তের যুগেও দৈন্যপীড়িত ও অসহায় মানুষদেরকে ক্রীতদাসরূপে পশুর মত বেচাকেনা করা হত। এই সমস্ত অত্যাচারিত মানুষদের আবেগ এবং অনুভুতির কোন মূল্যই ছিল না। বরং সেই সব ক্রীতদাসদের উপর যাবতীয় প্রকারের বর্বরতা ও নৃশংসতা চালানো সাধারণ বিষয় ছিল। এমন বর্বরতার যুগে আমাদের নবী (সা.) ছিলেন একমাত্র মানবদরদী যিনি কুরআন করীমের আলোকে এই অন্যায় এবং দাম্ভিকতার বিরুদ্ধে সাম্যের সফল অভিযানের সূচনা করেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করবে আল্লাহ্ তা'লা সেই ক্রীতদাসের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তে মুক্তিদানকারী ব্যক্তির প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য দোযখের আগুনকে হারাম করে দিবেন।

(সহী মুসলিম)

এইভাবে তিনি (সা.) বহু শতাব্দী প্রাচীন ক্রীতদাস প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেন। আজকে যদি বড় বড় কোম্পানীর মালিক ও বিত্তবানরা হুযুর (সা.)-এর এই আদেশের প্রতি ঈমান আনত তবে কতই না উত্তম হত!

আমাদের প্রিয় নবী হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর আরও একটি অনুগ্রহ হল ভ্রাতৃত্ববন্ধন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি সমগ্র মানবতাকে এই উপদেশ বাণী প্রদান করেন যে, প্রতিবেশীর সঙ্গে সব সময় নিষ্ঠা ও সহানুভুতির সম্পর্ক বজায় রাখবে। একবার তিনি (সা.) বলেন, প্রতিবেশীদের অধিকার সম্পর্কে এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, কখনো কখনো আমার মনে হয় প্রতিবেশীকে হয়তো উত্তরাধিকার দেওয়া হবে।

মক্কা বিজয়ের সময় আঁ হযরত (সা.)-এর সামনে তাঁর প্রাণের শত্রুদেরকে উপস্থিত করা হল, যারা তাঁকে এবং সাহাবাদেরকে যাতনা দিত। যুদ্ধের নিয়মানুসারে সেই সব অত্যাচারীদেরকে হত্যা করা উচিত ছিল। কিন্তু দয়ালু ও কৃপাবান রসুল (সা.) তাদের সকলকে একথা বলে মুক্ত করে দিলেন যে- লা তাসরিবা আলাইকুমুল ইয়াম'। অর্থাৎ আজকের দিনে তোমাদের প্রতি কোন আক্ষেপ নেই।

খোদার কৃপায় বর্তমান যুগে মানুষ প্রযুক্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে অপার উন্নতি লাভ করে চলেছে। নিত্যনতুন আবিষ্কারের কারণে পৃথিবী একটি বিশ্বজনীন পল্লী বা গ্রামে পরিণত হয়েছে। এই সত্য সর্বজনবিদিত। অপরপক্ষে এই কঠোর বাস্তবকেও অস্বীকার করা যেতে পারে না যে, বর্তমান যুগের মানুষ আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা, মানবীয় সহমর্মিতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। পৃথিবীতে এমন দেশ বা সমাজ নেই যেখানে জাতি-বিদ্বেষ ও ধর্ম-বিদ্বেষ দেখা যায় না। প্রশ্ন এটাই ওঠে যে, এই পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণ কি? যদি গবেষণামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় তবে এই সত্য সামনে আসবে যে, আজ একটি ধর্মের মান্যকারী অপর ধর্মের ধর্মগুরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না। পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.) হলেন একমাত্র নেতা যিনি কুরআন শরীফের আলোকে সমগ্র বিশ্বকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে যত সংখ্যক নবী এসেছেন তাঁরা সকলেই খোদা তা'লার নৈকট্যভাজন ও পবিত্র বান্দা ছিলেন। খোদা তা'লা তাদের সঙ্গে কথা বলতেন। অতএব সমস্ত নবীর প্রতি প্রত্যেক মানুষের কেবল সম্মান করাই নয় বরং সত্যনিষ্ঠভাবে তাদের উপর ঈমান আনাও কর্তব্য। এটিই একমাত্র পথ যার মাধ্যমে খোদা তা'লার ভালবাসা অর্জন করা সম্ভব। যদি আজ প্রত্যেকে মহানবী (সা.)-এর এই শিক্ষাকে গ্রহণ করে তবে এই পৃথিবী শান্তিনীড়ে পরিণত হবে। ইনশা আল্লাহ॥

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) " এখন আসমানে নীচে মাত্র একজনই নবী আছেন, এবং মাত্র একটিই কিতাব আছে; অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)- যিনি সকল নবীগণের চাইতে উন্নত এবং উত্তম এবং সকল রসূলগণের চাইতে শ্রেষ্ঠতর ও পূর্ণতর এবং যিনি নবীগণের মোহর, মানবগণের মধ্যে শ্রেষ্টতম, যাঁর আনুগত্য করলে খোদা তা'লাকে পাওয়া যায়।" (বারাহীনে আহমদীয়া, পৃষ্ঠা: ৫৩৫)

বিদায় হজ্জের সময় আঁ হযরত (সা.) মিনার ময়দানে যে জীবনদায়ী খুতবা প্রদান করেছিলেন তার একটি শব্দ উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার অস্তিত্ব এবং বিজয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করে। আজ সারা পৃথিবীতে জামাত আহমদীয়া একটি মাত্র মুসলিম জামাত যে প্রকৃত খিলাফত ব্যবস্থার অধীনে মহানবী (সা.)-এর অনুগ্রহরাজি প্রচার করে চলেছে।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ (সা.)-এর অনুগ্রহরাজির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতের মৈসুর ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এস.রামা কৃষ্ণা রাও Muhammad The Prophet of Islam - পুস্তকে লেখেন: There is Muhammad the businessman (অর্থাৎ মুহাম্মদ একজন আদর্শ ব্যবসায়ী) Muhammad the statesman (মুহাম্মদ একজন মহান চিন্তাবিদ) Muhammad the orator (মুহাম্মদ একজন মহান বক্তা) Muhammad the reformer (মুহাম্মদ একজন মহান সংস্কারক) Muhammad the refuge of orphans (মুহাম্মদ অনাথদের আশ্রয়স্থল) Muhammad the protector of slaves (মুহাম্মদ ক্রীতদাসদের পরিত্রাতা) Muhammad the emancipator of women (মুহাম্মদ নারীজাতির উদ্ধারকর্তা) Muhammad the judge (মুহাম্মদ একজন মহান বিচারক) Muhammad the saint Muhammad (মুহাম্মদ নবীদের সর্দার)

আল্লাহ্ তা'লার নিকট আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এ শিক্ষামালার উপর একনিষ্ঠভাবে আমল করার এবং তাঁর অনুগ্রহরাজিকে সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার করার তৌফিক দান করেন। আমীন।

১৯-এর পাতার পর

(সা.) ক্ষণিকের জন্যও বিলম্ব করেন নি এবং শত -সহস্র প্রতিকূলতা ও দুর্যোগপূর্ণ অবস্থারও পরোয়া করেন নি। বস্তুতঃ যখনই কোন বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ সেই বাণী পৌঁছে দিতে কাউকে পরোয়া করেন না এবং তা গোপন রাখাকে তেমনইভাবে শিরক মনে করে, যেমনভাবে আল্লাহ্‌র ওহীর দ্বারা সংবাদ না পেয়ে কোন বিষয় প্রচার করাকে শিরক মনে করে। যদি সে ওহী দ্বারা সংবাদ প্রাপ্ত হয়নি এমন বিষয় বর্ণনা করে, তবে বিষয়টি এমন দাঁড়ায় যে সে মনে করে যে, সে যা কিছু বুঝেছে তা খোদা তা'লাও বোঝেন নি এবং সে সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে মুশরিকে পরিণতে হয়। কুরআন করীমে যে সমস্ত বিষয় বর্ণিত আছে, যদি আঁ হযরত (সা.) সেগুলি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই বর্ণনা করে দিতেন তবে কুরআন শরীফের কী প্রয়োজন থাকত? মোটকথা যা কিছু খোদা তা'লা আমার নিকট উন্মোচন করেছেন আমি তৎক্ষণাত তা বর্ণনা করে দিয়েছি।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯২)

শান্তির অগ্রদূত
হযরত মুহাম্মদ (সা.)

নাসীর আহমদ আরীফ, মুরুব্বী সিলসিলা
অনুবাদ: মির্যা সফিউল আলাম

আল্লাহ্ তা'লার একাধিক গুণাবলী নামের মধ্যে একটি হল اَلسَّلام এবং আরেকটি হল المؤمن । আল্লাহ তা'লা কুরআন মজীদে বলেন-

هُوَاللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (سورة الحشر:24)

অর্থঃ তিনিই আল্লাহ্ যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি অধিপতি, অতি পবিত্র, শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদাতা, রক্ষাকর্তা, মহাপরাক্রমশালী, প্রতিবিধানকারী, (এবং) উচ্চ মর্যাদাবান। তারা যা শরীক করে আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

আমি তোমাকে কেবল জগতসমূহের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর গুণাবলী এবং নামের সাথে আস সালাম এবং আল-মোমেন নামের উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা। আল্লাহ্ তা'লার এই উভয়ের গুণের সর্বোত্তম বিকাশ ঘটেছে শান্তির দূত এবং পূর্ণ মানব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্তার মাধ্যমে। আঁ হযরত (সা.)-ই হলেন প্রকৃত 'আব্দুস সালাম' অর্থাৎ শান্তিদাতার (আল্লাহ্র) বান্দা এবং 'আব্দুল মোমেন' অর্থাৎ নিরাপত্তাদাতা (আল্লাহ্র) বান্দা যার মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তার কল্যাণধারা সূচিত হয়েছে। তিনি (সা.) পৃথিবীকে কেবল শান্তির বার্তাই দেন নি বরং তিনি পৃথিবীকে এমন উৎকৃষ্ট নীতিমালা উপহার দিয়েছেন যার দ্বারা পৃথিবীতে প্রকৃত ও চিরস্থায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

অনুরূপভাবে তিনি অপর আয়াতটিতে বলেন, আমরা আঁ হযরত (সা.)-কে পৃথিবীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। অর্থাৎ খোদার গুণ রহমত-এর তিনি পূর্ণ বিকাশস্থল। এই কারণেই তিনি (সা.) সমগ্র বিশ্বকে শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী শুনিয়েছেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

"বস্তুতঃ শান্তি তখনই অর্জিত হতে পারে যখন পৃথিবীতে এমন একজন পরম সত্তা বিরাজ করবে থাকবে যিনি শান্তিকামী হবেন এবং অপরকেও শান্তিদানে ব্যগ্র থাকবেন। এবং যিনি এমন আইন-শৃঙ্খলা বলবৎ করতে চাইবেন যা শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করবে। এবং সেই ব্যক্তিই প্রকৃত শান্তিদাতা বলে আখ্যায়িত হতে পারেন যে সেই পরম সত্তার দিকে মানুষকে আহ্বান করবে। এই শান্তিদাতা সত্তার দিকে আহ্বানকারী হলেন মহম্মদ (সা.)। রসূলে করীম (সা.)-ই হলেন সেই ব্যক্তি যার মাধ্যমে মানুষ অবগত হয় যে আল্লাহ্ তা'লার নামসমূহের মধ্যে একটি নামের অর্থ হল শান্তিদাতা। সূরা হাশরে আল্লাহ্ তা'লা বলেন- اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ- অর্থাৎ- হে মহম্মদ ! তুমি মানুষের মনোযোগ সেই খোদার দিকে আকর্ষণ কর যিনি বাদশাহ, পবিত্র এবং শান্তিদাতা। অর্থাৎ তিনিই হলেন পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তার উৎস।"

(আনোয়ারুল উলুম, ১৫তম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ১৯৪)

তিনি (সা.) তাঁর সাহাবগণকে যে মৌলিক শিক্ষা প্রদান করেছিলেন সেটি ছিল শান্তি ও নিরাপত্তার শিক্ষা। যেরূপ তিনি (সা.) বলেন:

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

অর্থাৎ প্রকৃত মুসলিমের পরিচয় হল, তার জিহ্বা (মুখের কথা) এবং হাত থেকে মানুষ নিরাপদ থাকবে। (মাসনদ আহমদ বিন হাম্বল)

আঁ হযরত (সা.) বিশ্ববাসীকে ধর্মীয় স্বাধীনাতার শিক্ষা দান করে শন্তি ও নিরাপত্তার দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেন। আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.) কে বলেছেন-'লা-ইকরাহা ফিদ্বীন'- অর্থাৎ ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই। (আল-বাকারা: ২৫৭) তিনি ঐশী শিক্ষার পরিণামে সমস্ত জাতির মানুষকে নিজের পবিত্রকরণ শক্তি এবং প্রেম,প্রীতি ও ভালবাসার দ্বারা শান্তিপূর্ণভাবে সকলকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। ধর্মীয় গুরু এবং পবিত্র ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ছাড়া সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আঁ হযরত (সা.) সমস্ত ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাগণকে সম্মান করার শিক্ষা দিয়েছেন। খৃষ্টানদের একটি প্রতিনিধি দল যখন নাজরান থেকে মদিনা এলে আঁ হযরত (সা.) তাদের আপ্যায়ন করেন। মসজিদ নবুবীতে তাদেরকে স্থান দেন, বরং নিজেদের পদ্ধতি অনুসারে তাদেরকে ইবাদত করারও অনুমতি দিলেন। সাধারণ মুসলমানরা তাঁকে এতে বাধা দিতে চাইছিল, কিন্তু তিনি (সা.) তাদেরকে নিষেধ করেন।

(সীরাতুন্নাবী, ২য় ভাগ, প্রণেতা- আল্লামা শিবলী নুমানী, পৃষ্ঠা: ৬১১)

একবার এক ইহুদীর সঙ্গে একজন মুসলমানের নবীগণের একে অপরে উপর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিবাদ হয়। মুসলমান ব্যক্তি ইহুদীকে প্রহার করে। ইহুদী ব্যক্তি আঁ হযরত (সা.)-এর নিকট অভিযোগ নিয়ে আসে। তিনি (সা.) পরম সম্মান ও শান্তির শিক্ষা দেন এবং অত্যন্ত শালীনতার সঙ্গে বলেন: لَا تُخَيِّرُوْنِيْ مِنْ بَيْنِ الْاَنْبِيَاءِ (সহী বুখারী, কিতাবুত তাফসীর)

অর্থাৎ আমাকে অন্যান্য নবীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিও না।

আরবভূমি সকল প্রকারের অন্যায় এবং অত্যাচারের পরিপূর্ণ ছিল। আঁ হযরত (সা.) অত্যাচারপূর্ণ এই ভূখণ্ডটিকে ন্যায়ের পীঠস্থানে পরিণত করেন। তাঁর সমস্ত যুদ্ধই ছিল প্রতিরক্ষামূলক। তিনি (সা.) কেবল তখনই তরবারী ধারণ করেছেন যখন তাঁর নিজের এবং সাথীদের বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করা হয়েছে। এতদসত্বেও তিনি শান্তির বাণীই প্রচার করে এসেছেন। তিনি (সা.) শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য 'মিসাকে মদিনা' (মদিনার অঙ্গিকার) এবং হুদাইবিয়া চুক্তি ছাড়াও নাজরানের প্রতিনিধি এবং খৃষ্টান গোত্র বনু সা'লাব-এর সঙ্গে শান্তি-চুক্তি সম্পাদান করেন। বিরোধীরাই সব ক্ষেত্রে এই সমস্ত চুক্তি-ভঙ্গ করে এসেছে। কিন্তু তিনি (সা.) সব সময় এই চুক্তিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছেন।

নাজরানের খৃষ্টানদের সঙ্গে যখন চুক্তি সম্পাদিত হয় তখন তিনি (সা.) তাদেরকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, জিযিয়া (রাজস্ব)-এর প্রতিদানে খৃষ্টানদের ধর্মীয় স্থানসমূহ এবং উপাসনাগারগুলির নিরাপত্তার দায়িত্ব মুসলমানদের উপর বর্তাবে। সেই সঙ্গে খৃষ্টানদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়। (সুনান, আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ)

মক্কা বিজয়ের সময় তিনি (সা.) ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার এক অনন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। সেই সময় তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করার তাঁর পুরো অধিকার ছিল, কেননা মক্কাবাসীরা হুদাইবিয়ার সন্ধি উল্লঙ্ঘন করেছিল। কিন্তু তিনি (সা.) মক্কার উপর আক্রমণ না করে, একবিন্দু রক্ত না ঝরিয়ে মক্কা বিজয় করেন।

মদিনায় হিজরতের পর আঁ হযরত (সা.) শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং মদিনায় ইসলামী শাসনের ভিত্তি রাখেন। তিনি (সা.) ইহুদীদের সঙ্গে মদিনায় বিভিন্ন বিষয় বোঝাপড়ার জন্য শন্তি-চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তিটিকে মদিনায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিতি প্রচেষ্টা হিসেবে স্বীকার করা হয়। ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার করা হয় এবং বহিরাগত আক্রমণকে সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করার জন্য চুক্তি সম্পাদিত হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আঁ হযরত (সা.)-এর এটি ছিল এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত যার ফলে মদিনা শন্তিনীড়ে পরিণত হল।

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক মূহুর্তে আঁ হযরত (সা.) মিনায় যে খুতবা প্রদান করেছিলেন সেটি ছিল এক বিশ্বজনীন শান্তির বার্তা এবং আজও সেটি পৃথিবীর শান্তির নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দান করে। সেই মহা গুরুত্বপূণ খুতবার কিছু অংশ পেশ করা হল- তিনি (সা.) বলেন-

" হে মানুষ সকল! যা কিছু আমি তোমাদেরকে বলছি তা মনোযোগ সহকারে শোন এবং স্মরণ রেখ! সমস্ত মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। যে কোন জাতি বা গোত্রের সঙ্গে সম্পর্ক রাখ না কেন, তোমরা সকলে সমান। তোমরা যে কোন মর্যাদার অধিকারী হও না কোন তোমরা সকলে পরস্পর সমান।"

অতঃপর বলেন: " যেরূপ এই মাস, এই ভূমি এবং এই দিনটি তোমাদের জন্য সম্মানযোগ্য, অনুরূপে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাণ, সম্পদ ও সম্ভ্রমকে সম্মানযোগ্য আখ্যায়িত করেছেন। কোন ব্যক্তির প্রাণ ও সম্পদ হরণ করা অথবা তার সম্মানের উপর আক্রমণ করা ততটাই অত্যাচার ও গর্হিত কর্ম যেরূপ আজকের এই দিন, বা এই মাস ও এই পবিত্রভূমির সম্মানকে পদদলিত করা। যা কিছু আদেশ আজকে আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি সেগুলিকে কেবল আজকের জন্য প্রযোজ্য বলে মনে করো না, বরং এই আদেশ চিরতরের জন্য, এগুলিকে স্মরণ রাখ এবং এই আদেশমালা পালন করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যু আসে"।

পাশ্চাত্যের দেশের ভাষাবিদ ও সাধারণ মানুষদের মধ্যে এই ভ্রান্তধারণা রয়েছে যে, ইসলাম অ-মুসলমানদের প্রতি অন্যায়পূর্ণ আচরণের শিক্ষা দেয় এবং তাদেরকে মৌলিক অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত করে। ইসলামের বিরোধী শক্তিরা নিজেদের এই ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত প্রচারের মাধ্যমে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধকে নষ্ট করতে চাইছে। তাদের নিকট বর্তমান যুগে বিশ্ব-শান্তির জন্য সব থেকে বড় বিপদ হল ইসলাম ধর্ম এবং এর অনুসারীরা। এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্তধারণা এবং কুরআন মজীদ এবং আঁ হযরত (সা.)-এর শিক্ষার পরিপন্থী। মুসলমানদের উপর এ অভিযোগও আরোপ করা হয় যে, এরা ইসলাম বিরোধীদের সঙ্গে সদাচারণ করে না। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবী (সা.)-এর মাধ্যমে তাদেরকে আদেশ করছেন যে, তাদেরকে ক্ষমা কর এবং শান্তির বার্তা দাও। আল্লাহ্ তা'লা বলেন -

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ তাদের সঙ্গে ক্ষমার আচরণ কর এবং শান্তির বার্তা দাও। অচিরেই তারা জেনে নিবে।

ইসলামের উপর এই অভিযোগও আরোপ করা হয় যে, এই ধর্ম অ-মুসলিমদের প্রতি দুর্ব্যবহার করার শিক্ষা দেয়। ইসলাম হল দয়া ও কৃপার ধর্ম। ইসলাম শত্রুর সঙ্গে পর্যন্ত অন্যায় এবং দুর্ব্যবহার করা পছন্দ করে না। ইসলাম শান্তিপ্রিয় এবং ক্ষমাপরায়ণতার ধর্ম। ইসলাম যদিও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মানব প্রকৃতির কথা দৃষ্টিপটে রেখে যদিও এই অধিকার প্রদান করেছে যে, কেউ চাইলে অনুরূপ অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু একথাও বলা হয়েছে যে, ক্ষমার পথ অবলম্বন করা শ্রেয়। যে ব্যক্তি ক্ষমাপরায়ণতাকে পছন্দকে করে তার প্রতিদান আল্লাহ্‌র নিকট। অতএব ইসলাম হল শান্তি ও সৌহার্দ্যের ধর্ম যা অত্যাচার ও উগ্রতাকে এক মূহুর্তের জন্যও বরদাস্ত করে না। ইসলামের শিক্ষা দেয় যে, উগ্রতা ও অত্যাচারের পরিণামে মানব প্রকৃতি বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সমাজ ধ্বংস হয়ে যায় এবং পৃথিবীতে অশান্তি ও নৈরাজ্য বিরাজ করে। ইসলাম মতে সমস্ত মানবজাতিই হল আল্লাহ্‌র পরিবার এবং ইসলাম সকলের সঙ্গে সদাচারের আদেশ দেয়। শুধু তাই নয়, ইসলাম পশুদেরকেও কষ্ট ও যন্ত্রণা দেওয়ার বিরোধীতা করে। ইসলামের শিক্ষামালা থেকে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম হল কৃপার ধর্ম। ইসলামে অন্যায়, অত্যাচার, সন্ত্রাস এবং বর্বরতার কোন স্থান নেই।

কুরআন করীম শান্তি ও ভালবাসার শিক্ষায় পরিপূর্ণ। আঁ হযরত (সা.) হলেন যার পূর্ণ বিকাশস্থল। সংকীর্ণ দৃষ্টির মানুষ যারা ইসলামের উপর অযথা এই অভিযোগ করে যে, ইসলাম সন্ত্রাসের শিক্ষা দেয়-সেটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ইসলাম তার বিরোধীদের প্রতি সদব্যবহার এবং এবং অন্যান্য ধর্মের প্রবর্তকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দেয়। বর্তমানে সন্ত্রাসী সংগঠনগুলি নিরীহ ও নিষ্পাপ মানুষদেরকে অবিচারে হত্যা করে চলেছে। তাদের এই আচরণ সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বহির্ভুত এবং আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শ থেকে যোজন যোজন মাইল দূরে। ইসলামের ইতিহাসে এমন একটিও ঘটনা নেই যেখানে তিনি (সা.) মুসলমান অথবা অ-মুসলিমকে হত্যা করার বা তাদেরকে যাতনা দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া যেখানে কিছু ঘোর অপরাধীদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল যারা নিজেদের জঘন্য অপরাধের কারণে শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল। তিনি (সা.) সবসময় ভালবাসা ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করেছেন। তাঁর দৈনন্দিন জীবন ক্ষমার অসাধারণ সব উদাহরণে পরিপূর্ণ। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি (সা.) ঘোর অত্যাচারীদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, পৃথিবীতে যার নজির আজও পাওয়া যায় না। .

যুগের ইমাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে বলেন:

" আমি সর্বদা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করি যে,এই যে আরবী নবী যাঁর নাম 'মুহাম্মদ' (তাঁর প্রতি হাজার হাজার দরুদ ও সালাম), তিনি কতই না উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর উচ্চ অবস্থান বা মোকামের সীমা কল্পনাও করা যায় না এবং তাঁর পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ও কার্যকারিতার সঠিক অনুমান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আফসোস যে, তাঁর মর্যাদা যেভাবে সনাক্ত করা উচিত ছিল, সেভাবে সনাক্ত করা হয় নি। সেই তওহীদ যা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তিনিই একমাত্র বীরপুরুষ, তা দুনিয়াতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষের প্রতি ভালবাসায় জীবন অতিবাহিত করেছেন।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ১১৮)

অতএব আজকেও যদি বিশ্ববাসী আঁ হযরত (সা.)-এর শিক্ষামালা এবং তাঁর দ্বারা বর্ণিত মহান নীতিমালার উপর ঈমান আনে এবং সেগুলির সত্যনিষ্ঠভাবে অনুশীলন করে, তবে খোদার কৃপা ও অনুকম্পায় পৃথিবীতে বিরজমান অশান্তি ও নৈরাজ্যের চিরবসান ঘটবে এবং পৃথিবী যথার্থই হয়ে উঠবে শান্তি-নীড়।

১৯-এর পাতার পর...

গুরুত্ব দেওয়া হত না যে তাদের ইসলাম গ্রহণের ফলে অন্যরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

সংখ্যায় নগণ্য হওয়ার কারণে এঁরা নিজেদেরকে প্রকাশ করতেন না। অনেক সময় মুসলমানেরা একে অপরের সঙ্গে মিলিতও হত কিন্তু তাঁরা নিজেদের মুসলমান হওয়ার পরিচয় গোপনই রাখতেন। এমনই সব দুর্বল, দরিদ্র ও বাহ্যতঃ অসহায় মানুষদের নিয়েই ইসলামের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু ঐ সকল দূর্বল মানুষদের সঙ্গে খোদা তা'লার শক্তি ছিল, তিনি বিরোধী কুফফারদের মধ্য থেকে বেছে বেছে এমন মানুষদেরকে ইসলামের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করাচ্ছিল যাতে ইসলামে শক্তি বৃদ্ধি পায়। এখন মক্কার একজন বীরযোদ্ধার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা শুনুন।

হযরত ওমর (রা.) ইসলামের ঘোর শত্রুদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি যে কোন প্রকারে এই নতুন ধর্মের প্রসার বন্ধ করতে চাইছিলেন।

" একদিন তাঁর মনে এই ধারণার উদয় হল যে, এই ধর্মের প্রবর্তককে খতম করলেই তো যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এই চিন্তা করে তিনি তরবারি হাতে নিয়ে হযরত রসুলুল্লাহ (সা.)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বার হলেন। পথিমধ্যে কেউ জিজ্ঞাসা করল যে, ওমর তুমি কোথায় যাচ্ছ? তিনি উত্তর দিলেন আমি মহম্মদ (সা.) হত্যা করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। সেই ব্যক্তি হেসে বলল: নিজের ঘরের সংবাদ নাও। তোমার বোন ও ভগ্নীপতি তাঁর উপর ঈমান এনেছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন: মিথ্যা কথা। সে্ ব্যক্তি বলল, তুমি নিজে গিয়ে দেখে নাও।"

হযরত ওমর (রা.) যখন সেখানে গেলেন ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। ভিতরে একজন সাহাবি (রা.) কুরআন মজীদ পড়াচ্ছিলেন। তিনি (রা.) দরজার কড়া নাড়লেন। তাঁর ভগ্নীপতি জিজ্ঞাসা করলেন- কে? হযরত ওমর (রা.) উত্তর দিলেন: ওমর। তারা যখন দেখলেন যে, ওমর এসেছেন, তখন তারা সেই সাহাবী যিনি কুরআন করীম পড়াচ্ছিলেন তাঁকে এবং কুরআন মজীদের পৃষ্ঠাগুলি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে দিলেন এবং তারপর ঘরের দরজা খুললেন। কেননা তারা জানত যে, হযরত ওমর (রা.) ইসলামের ঘোর বিরোধী। হযরত উমর যেহেতু একথা শুনে এসেছিলেন যে, তারা মুসলমান হয়ে গিয়েছে, তাই তিনি আসা মাত্রই জিজ্ঞাসা করলেন যে দরজা খুলতে এত দেরী হল কেন?

তাঁর ভগ্নীপতি উত্তর দিলেন: এমনিই দেরী হল। হযরত ওমর (রা.) বললেন, একথাটি সত্য নয়, অন্য কোন কার দরজা খুলতে বাধা সৃষ্টি করেছে। আমি শুনেছি, তোমরা সেই সাবীর(মুশরিকরা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লেল্লাহু ওয়া আলেইহে ওয়া সাল্লামকে সাবী বলত) কথা শুনছিলে। তারা বিষয়টি ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু এতে হযরত ওমর (রা.) ক্ষুব্ধ হলেন, তিনি (রা.) তাঁর ভগ্নীপতিকে মারতে উদ্যত হলেন। তাঁর বোন স্বামীর ভালবাসার কারণেই তাদের দুজনের মাঝে এসে দাঁড়াল। হযরত ওমর হাত তুলে ফেলেছিলেন, আর তাঁর বোন সহসা মাঝে এসে পড়ায় তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি। তাঁর হাত সজোরে বোনের নাকে এসে আঘাত করে যার ফলে নাক থেকে রক্ত ঝরে পড়ে। হযরত ওমর (রা.) অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। একথা চিন্তা করে যে, তিনি একজন মহিলার উপর হাত উঠিয়েছেন আর সে কিনা তাঁর নিজের বোন আর যেহেতু আরবে প্রথা অনুযায়ী মহিলাদের উপর হাত উঠানো নিষিদ্ধ ছিল, তাই তিনি পরিস্থিতি সামাল দিতে বললেন, আচ্ছা আমাকে দেখাও যে তোমরা কি পড়ছিলে।

একথা শুনে তাঁর বোন উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর মধ্যে সহানুভুতি ও কোমলভাব জেগেছে। তিনি বললেন, তোমার মত ব্যক্তির হাতে আমি সেই পবিত্র বস্তু দিতে প্রস্তুত নই। হযরত উমর বললেন, " তবে আমার কি করনীয়? "

বোন বলল: ওইখানে পানি রাখা আছে, স্নান করে এস, তবেই আমি তোমার হাতে সেই বস্তুটি দিতে পারি। হযরত ওমর স্নান সেরে এলেন। বোন কুরআন করীমের পৃষ্ঠাগুলি তাঁর হাতে দিলেন। হযরত ওমরের হৃদয়ে এক প্রকার পরিবর্তন এসে গিয়েছিল, তাই কুরআন করীমের আয়াত পাঠ করতেই তাঁর মন বিগলিত হয়ে যায়। আয়াত পাঠ করা শেষ করে তিনি অবলীলায় বলে উঠলেন:

'আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রসুলাহু'

এই বাক্য পাঠ করা শুনে সেই সাহাবীও বেরিয়ে আসেন যিনি ভয়ে লুকিয়ে পড়েছিলেন। এরপর হযরত ওমর (রা.) জানতে চাইলেন যে, আজকাল হযরত রসূলে করীম (সা.) কোথায় আছেন?

হযরত রসূলে করীম (সা.) সেই সময় বিরোধীতার কারণে ঘর পরিবর্তন করতে থাকতেন। তিনি বললেন, বর্তমানে তিনি 'দারে রাকিম'-এ অবস্থান করছেন। হযরত ওমর (রা.) তৎক্ষণাৎ খোলা তরবারী হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

সেই ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। বোনের মনে সংশয় দেখা দিল যে, তিনি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে যাচ্ছেন না তো? তাই তিনি সামনে এসে পথ আঁটকে দাঁড়ালেন এবং বললেন: খোদার কসম! আমি তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত যেতে দিব না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আশ্বস্ত করবে যে তুমি কোন ক্ষতি করবে না।

হযরত ওমর (রা.) বললেন: আমি কথা দিচ্ছি যে, কোন ফাসাদ করব না।

হযরত ওমর (রা.) সেখানে দরজার কড়া নাড়লেন। হযরত রসুলে করীম (সা.) এবং সাহাবাগণ ভিতরে বসে ছিলেন। শিক্ষাদান চলছিল। একজন সাহাবা জিজ্ঞাসা করলেন যে, দরজায় কে? হযরত ওমর উত্তর দিলেন: ওমর।

সাহাবাগণ বললেন:হে রসুলুল্লাহ (সা.) দরজা খোলা উচিত নয়। নচেত সে কোন ফাসাদ করে বসবে। হযরত হামযা (রা.) সদ্য ঈমান এনেছিলেন। তিনি যোদ্ধার মত বললেন: দরজা খুলে দাও, আমি দেখছি সে কি করে।

অতএব একজন সাহাবা উঠে দরজা খুলে দিলেন। হযরত ওমর (রা.) এগিয়ে এলে হযরত রসুলে করীম (সা.) বললেন: হে ওমর ! তুমি আর কতদিন আমার বিরোধিতা করে যাবে? হযরত ওমর বললেন: হে রসুলুল্লাহ (সা.) আমি বিরোধিতা করতে আসি নি। আমি তো আপনার দাসত্ব স্বীকার করতে এসেছি।

সেই ওমর যিনি এক ঘন্টা পূর্বে ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং হযরত রসূলে করীম (সা.) কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়েছিলেন তিনি এক মূহুর্তে একজন উচ্চ শ্রেণীর মোমিন হয়ে গেলেন। হযরত ওমর (রা.) মক্কার নেতাদের মধ্যে ছিলেন না, কিন্তু বীরত্বের কারণে যুবকের উপর তাঁর বেশ প্রভাব ছিল। তিনি মুসলমান হয়ে ফলে সাহাবাগণ উত্তেজনা ও আবেগে নারা ধ্বনি দিতে লাগলেন। এর পর নামাযের সময় হলে রসুলুল্লাহ (সা.) নামায পড়ার উদ্যোগ করলেন। একঘন্টা পূর্বে যে ওমর হযরত রসুলুল্লাহ (সা.)কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন, সেই ওমরই পুনরায় তরবারী বার করে বললেন:

"হে রসুলুল্লাহ (সা.)! খোদা তা'লার রসুল এবং তাঁর মান্যকারীরা লুকিয়ে নামায পড়বে আর মক্কার মুশরিকরা বাইরে বীর-বিক্রমে ঘুরে বেড়াবে- এটা কি করে সম্ভব হয়? আমি দেখব যে, আমাদেরকে খানা কাবায় নামায পড়া থেকে বাধা দেয়।" (তফসীর কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪১-১৪৩)

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নবুয়তের দায়িত্ব অর্পিত হওয়া তিন বছর অতিক্রান্ত হল। তিনি (সা.) নীরবে প্রজ্ঞার সাথে সত্যের বাণী পৌঁছে দিচ্ছিলেন, কেননা খোদা তা'লার এটিই আদেশ ছিল। অতঃপর খোদা তা'লা প্রকাশ্যে প্রচার করার আদেশ দিলেন।

নবুয়তের ৪র্থ বছরে আল্লাহ্ তা'লা আদেশ দিলেন: অতএব তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা তুমি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর। (সুরা হিজর: ৯৫)

হে রসুল! তোমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তুমি তোমার নিকটাত্মীয়স্বজনদের সতর্ক কর।(সূরা শো'রা: ২১৫)

তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার আদেশ শিরোধার্য করে একদিন সাফা পাহাড়ে বিভিন্ন গোত্রের নাম ডেকে তাদেরকে সমবেত করলেন। আলে গালেব, লুব্বী গোত্র, আলে মুরা, আলে কুলাব এবং আলে কুসা-র লোক একত্রিত হলেন। তাদের মধ্যে আবু লাহাবও ছিল।

তিনি (সা.) নিজের বক্তব্য শুরু করলেন।

তোমরা আমার আত্মীয়। আমাকে দীর্ঘ সময় ধরে চেন। আমার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে সম্যক অবগত আছ। তোমরা বল যে, আমি কি কখনো মিথ্যা বলেছি?

তারা একবাক্যে উত্তর দিল: কক্ষনো নয়, আপনি সর্বদা সত্য বলেন।"

তিনি (সা.) বললেন:

" আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, এই ছোট পাহাড়টির পেছনে একটি বিশাল সেনা বাহিনী তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য ওত পেতে লুকিয়ে আছে, তবে কি তোমরা বিশ্বাস করবে?"

যদিও সেখানে এমন কোন আড়াল হওয়ার স্থান ছিল না যার পিছনে একটি সৈন্য বাহিনী লুকিয়ে থাকতে পারে বরং পাহাড়ের পিছনে একটি প্রশস্ত ময়দান ছিল। কিন্তু তা সত্বেও তারা বলল, যদি আপনি বলেন তবে বিশ্বাস করব। কেননা, আমরা জানি যে, আপনি কখনো মিথ্যা বলেন না।

হযরত রসূল করীম (সা.) বললেন: যদি তোমরা আমাকে সত্যবাদী মনে কর, তবে আমি তোমাদেরকে বলছি, খোদা তা'লা আমাকে বলেছেন যে, আমি তাঁর রসুল এবং তিনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি যেন তোমাদেরকে সতর্ক করি এবং তোমাদেরকে মূর্তি পূজা থেকে বিরত রাখি। যদি তোমরা আমার কথা না শোন তবে ধ্বংস হয়ে যাবে।

মক্কাবাসীরা যারা কিনা কিছুক্ষণ পূর্বেই বাহ্যতঃ অসম্ভব বিষয়ের উপরও তাঁকে সত্য বলে স্বীকার করছিল, তারাই সহসা এই কথাটি স্বীকার করতে অস্বীকার করে বসল। তাঁর কথা আগে শুনলও না। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি আরম্ভ করে দিল যে দেখ! এর কি হয়েছে! কেমন অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছে! একথা বলে তারা এদিক সেদিক চলে গেল। আবু লাহাব বলল,

হে মহম্মদ! তুমি নিপাত যাও। তুমি এই সামান্য বিষয়ের জন্য আমাদেরকে একত্রিত করেছ? (তফসীরে কবীর, ১০ম খণ্ড)

রসূলুল্লাহ (সা.) দেখলেন যে, তাঁর কথাকে কেউই গুরুত্ব দিল না। তাই তিনি (সা.) অন্য পথ অবলম্বন করলেন। হযরত আলি (রা.)কে বললেন, আব্দুল মুতালেবের পরিবারকে ভোজনের আমন্ত্রন দাও। তিনি (সা.) চাইছিলেন, ভোজনের পর তাদেরকে আল্লাহ্ বাণী শোনাবেন। সকল নিকটাত্মীয়রা এলেন, যারা প্রায় চল্লিশ জন ছিলেন। ভোজনের পর তিনি (সা.) যখন নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে চাইলেন সকলেই উঠে চলে যেতে গেল, কেউই তাঁর কথা শুনল না। হযরত আলি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে আরও একটি দাওয়াতের বন্দোবস্ত করলেন। তিনি (সা.) ভোজনের পূর্বে আত্মীয়দের সম্বোধন করে বললেন-

হে আব্দুল মুতালেবের বংশধরগণ! দেখ আমি তোমাদের নিকট এমন বিষয় নিয়ে এসেছি যার থেকে উত্তম আমাদের গোত্রের নিকট কেউ কখনো নিয়ে আসে নি। আমি তোমাদেরকে খোদার দিকে আহ্বান করছি। যদি তোমরা আমার কথা শোন তবে ইহকাল ও পরকালের সর্বোত্তম নিয়ামতরাজির উত্তরাধিকারী হবে। বল তোমাদের মধ্যে থেকে কে আমার সাহায্যকারী হবে? সকলেই নীরব ছিল, পুরো বৈঠক নিস্তব্ধতা ছেয়ে গিয়েছিল। হঠাৎই এককোন থেকে একজন তের বছরের শীর্ণকায় বালক উঠে দাঁড়াল অশ্রুসিক্ত চোখে বলে উঠল

" যদিও আমি সব থেকে দুর্বল এবং সব থেকে ছোট, কিন্তু আমি আপনার সঙ্গ দিব"

এটি ছিলেন হযরত আলি (রা.)। হযরত রসূলে করীম (সা.) হযরত আলির এই কথা শুনে নিজের আত্মীয়-স্বজনদের দিকে চেয়ে বললেন, " যদি তোমরা জান তবে নিজেদের ছেলেটির কথা শোন এবং এবং তাকে স্বীকার কর।"

উপস্থিত আত্মীয়গণ এই দৃশ্য দেখে শিক্ষা গ্রহণ করার পরিবর্তে সমস্বরে উচ্চহাসি হেসে ওঠল। আবু লাহাব তার বড় ভাইকে বলল- " এখন মহম্মদ তোমাকে ছেলের আনুগত্য করার আদেশ দিচ্ছে।" এর পর এরা ইসলাম এবং মহম্মদ (সা.)-এর দুর্বলতাকে উপহাস করতে করতে বেরিয়ে গেল।

(তিবরী, সীরাত খাতামান্নাবী, পৃষ্ঠা: ১৬৭-১৬৯)

মক্কার দুষ্ট প্রকৃতির মানুষেরা মনে করল যে, কোন কোন ভাবে এই নতুন ধর্মের পথ আটকাতে হবে। তারা বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে থাকল। কিন্তু মক্কার কিছু সৎ প্রকৃতির মানুষ এই নতুন ধর্ম সম্পর্কে জানতে মহম্মদ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতে লাগলেন। তাঁর কাছে লোকদের আসতে দেখে বাধাদানকারীরা বিভিন্নভাবে তাঁকে নির্যাতন করতে আরম্ভ করল। তাঁর কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হওয়ার কারণে তিনি (সা.) তবলীগ এবং নতুন মুসলমানদের তরবীয়তের জন্য একটি ঘরকে কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই পবিত্র ঘরটি ছিল একজন সাহাবী হযরত আরকম বিন আবি আরকম (রা.)-এর। এই ঘরটিকে 'দারে আরকম' বল হত। পরবর্তীকালে সেটিকে দারুস সালাম বলা হত। দারে আরকম সাফা পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে ৩৫ থেকে ৪০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত ছিল। এই গৃহটিতে পাথরের দুটি কক্ষ ছিল। এটি ছিল মুসলমানদের প্রথম পাঠশালা, প্রথম প্রচারকেন্দ্র এবং প্রথম ইবাদতগাহ। তিন বছর অর্থাৎ নবুয়তের ৪র্থ বছর থেকে ৬ষ্ঠ বছর পর্যন্ত এটিই ছিল মুসলমানদের কেন্দ্র। তবলীগও করা হত অত্যন্ত নীরব প্রজ্ঞাপূর্ণ উপায়ে। মোটকথা নতুন মুসলমানগণ এবং ইসলামের কারণে নির্যাতিতরা এখানেই একত্রিত হতেন।

মহানবী (সা.)-এর উপর প্রাথমিক যুগে ঈমান আনয়নকারী পরিবারগুলির মধ্যে একটি ছিল হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-এর পরিবার। হযরত আম্মার (রা.) সেই সময় ঈমান আনেন যখন মহানবী (সা.) দারে আরকমে অবস্থান করছিলেন। ইসলামের বাণী তাঁকে প্রভাবিত করলে তিনি (রা.) আকাঙ্খা পোষণ করেন যে, নিজে গিয়ে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে শুনবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি (রা.) দারে আরকমের পথ ধরলেন। পথিমধ্যে হযরত সুহেব বিন সুন্নান (রা.) -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। কথায় কথায় তাঁরা জানতে পারেন যে, উভয়কেই একই প্রেমাস্পদের আকর্ষণ টেনে এনেছে। তাঁরা উভয়েই একসঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। এইভাবে তাঁরা প্রথম সাতজন মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত আম্মার (রা.)-এর মায়ের নাম ছিল হযরত সুমাইয়া (রা.) এবং পিতার নাম ছিল হযরত ইয়াসির (রা.)। এই পরিবারটির উপর কুফফাররা সীমাহীন নির্যাতন চালায়। খোদার পথে তাদেরকে অসহনীয় কষ্ট দেওয়া হয়েছে।

(আসাদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৪)